দুই বিপদ
তৃণমূল - বিজেপি

হিংস্র উগ্র দক্ষিণপন্থী বাহিনী

নয়া উদারবাদী পর্বে ধান্ধার ধনতন্ত্রের ঔরসজাত তৃণমূল কংগ্রেস দলটি আসলে ক্ষমতালোভী। একক ব্যক্তির উদগ্র উচ্চাকাঙ্খার চারপাশে মোতায়েন হওয়া একটি হিংস্র উগ্র দক্ষিণপন্থী বাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের মতো বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরনো ঘাঁটিতে এই বাহিনীর স্বাভাবিক সম্বল হলো সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টসুলভ হিংস্র স্বৈরাচার। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতীয় গণতন্ত্রে সুদূরপ্রসারী বিপদের বার্তাবহনকারী। শাসকশ্রেণীর সবচেয়ে কদর্য স্বার্থের প্রতিনিধি।

আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং সাংবিধানিক বিধি-নিয়মের এরা তোয়াক্কা করে না। চমক, চটকদারি এবং প্রতারণা তৃণমূলের স্বভাব-ধর্ম। দুর্নীতি, ঘুষ, জুলুম, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট কারবার এই দলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

জাতপাত-ভাষাগত বিভেদ, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষপ্রবণতায় ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে ঘোঁট পাকানো তৃণমূলের স্বভাবজাত।

অর্থনৈতিক প্রশ্নেও এরা ঘোর নয়া-উদারবাদী। তৃণমূল কংগ্রেস সবসময়ই বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পক্ষে। মুখে জনমোহিনী স্লোগানের অনর্গল ফোয়ারা— কাজে আপাদমস্তক কর্পোরেটপন্থী।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদ মজ্জাগত

রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি তৃণমূলের মজ্জাগত। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিত্য নতুন ভেক ধরতে এরা পটু। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে প্রতিটি নতুন পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রী প্রয়োজনমত নতুন প্রচার-প্যাকেজ পরিবেশন করেন। চরম ক্ষমতালোভী বলেই তৃণমূল নির্লজ্জ

সুবিধাবাদী। দেশ, দেশের মানুষ, রাজ্যের মানুষ, সমাজ, সংকট, সমস্যার ঘুর্ণিজাল এসবে ওদের মাথাব্যাথা নেই। জনস্বার্থে কোন নীতিগত অবস্থান তৃণমূল কংগ্রেস কখনও নেয়নি। সরকারী ক্ষমতা হাসিল করাই এদের শেষ কথা।

তৃণমূল কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারি। জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে তৈরি হলেও জন্মলগ্ন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের হাঁটতে শেখা বিজেপি'র হাত ধরে। তারপর কখনও বিজেপি, কখনও কংগ্রেস। সরকারী ক্ষমতা ভোগ তার মূল লক্ষ্য। সরকারী ক্ষমতার ভাগ পেতে তৃণমূল দল শিবির বদল করেছে সুবিধামত।

রাজ্যে ক্ষমতাদখল করতেই তৃণমূল দোস্তি করে মাওবাদীদের সঙ্গেও। আরএসএস, আনন্দমার্গী এবং কামতাপুরী সশস্ত্র বাহিনীর (কে এল ও) সঙ্গেও তৃণমূলের অশুভ আঁতাত। চরম দক্ষিণপন্থী থেকে চরম বামপন্থী আঁতাতের হোতা তৃণমূলের পেছনে ছিল সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল, কর্পোরেট ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদত।

রাজ্যে বিরোধী পক্ষ হিসেবে তৃণমূল বরাবরই ছিল ধ্বংসাত্মক। এখন রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা কব্জা করে তৃণমূল আরও বেপরোয়া। দেউলিয়া অর্থনীতি, সীমাহীন দুর্নীতি, আর্থিক কেলেঙ্কারী, বেপরোয়া সরকারী ধাপ্পা, ফ্যাসিস্ট পদ্ধতির নজিরহীন হিংসায় অবরুদ্ধ গণতন্ত্র।

সবসময়ই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পাশে

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মমতা ব্যানার্জি তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের আগে থেকেই এসব চলছে।

১৯৯২ সালের শেষদিকে বাবরি মসজিদ ভাঙতে দলে দলে 'করসেবক'রা অযোধ্যায় জড়ো হচ্ছেন, ততক্ষণে সেই আশঙ্কার খবর সারা দেশেই ছড়িয়েছিল। বিজেপি-র সেই মারাত্মক কর্মসূচির বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) প্রচার শুরু করে। ১৯৯২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বামফ্রন্টের ডাকে শহীদ মিনার ময়দানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনসভা হয়। সেদিন মমতা ব্যানার্জিও কলকাতায় সিধো-কানহু ডহরে একটি সভায় বলেন, ''সিপিএম ষড়যন্ত্র করছে।''

১৯৯৩-এর ২১শে জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযান হয় মেয়ো রোডে। নৈরাজ্যবাদী হিংসাত্মক রাজনীতি তাঁর হাতিয়ার হয়ে উঠে।

১৯৯৭ সালের ৯ই আগস্ট মমতা ব্যানার্জি 'তৃণমূল কংগ্রেস' গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেন। দলের মধ্যে দল। কলকাতায় তখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় প্লেনারি অধিবেশন চলছিল। তখনই তিনি ১৩ই আগস্ট ঘোষণা করেন 'তৃণমূল কংগ্রেস'-এর 'স্টিয়ারিং কমিটি'র সদস্যদের নাম।

১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে মমতা ব্যানার্জি প্রথম স্পষ্টভাবে বলেন, ''বিজেপি অচ্ছুত নয়''। তিনি বলেন, ''বিজেপি একটি গণতান্ত্রিক দল এবং জনসাধারণই তাদের নির্বাচিত করেছে। সেই বিজেপি-কে কীভাবে আমরা অস্পৃশ্য বলবো।'' (গণশক্তি, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭)। ১৯৯৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর কংগ্রেস নেতৃত্ব মমতা ব্যানার্জিকে দল থেকে বহিস্কার করে।

খাল কেটে এনেছে সাম্প্রদায়িকতার কুমীর

১৯৯৮ সালে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় ফেব্রুয়ারিতে। নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন পর্বের আর্থ-রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি বিজেপি-র সামনে শাসক শ্রেণীর অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে ওঠার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে। রাজ্যে রাজ্যে নানা কৌশল অনুসরণ করে বিজেপি তখন দলের সর্বভারতীয় পরিচয় গড়ার চেষ্টা করছে। ঠিক তখনই সদ্য গঠিত তৃণমূল কংগ্রেস দলকে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি হাত ধরেন বিজেপি-র।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসই প্রথম রাজনৈতিক দল যারা সরাসরি সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী জোট স্থাপন করে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুমীরকে রাজ্যে ঢোকাতে খাল কেটেছিল তৃণমূল কংগ্রেস'ই।

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে জোট বেঁধে তৃণমূলের যাত্রা শুরু। পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা-লোকসভার ভোট সর্বস্তরে বিজেপি এবং তৃণমূল জোট একসঙ্গে থেকেছে। কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট ও সরকারে শরিক থেকেছে তৃণমূল। তৃণমূল-বিজেপি জোট পশ্চিমবঙ্গে চালিয়েছে পুরসভা, পঞ্চায়েত, এমনকি কলকাতা কর্পোরেশনও। রাজ্যে বামবিরোধী যাবতীয় রাজনৈতিক অপরাধের তারা যৌথ শরিক। কেশপুর, পাঁশকুড়া, জঙ্গলমহল, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম— সর্বত্রই।

১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে আসন

সমঝোতা করে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস। আজ থেকে দু'দশক আগে এই জোট ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুণগতভাবে নতুন এক বিপজ্জনক উপাদান। সেই সময় বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানি বলেছিলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সঙ্গে তৃণমূলের এই জোট একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।'' অন্যদিকে জ্যোতি বসু বারবার বলতেন, ''তৃণমূলের সবচেয়ে বড় অপরাধ ওরা সাম্প্রদায়িক বিজেপি-কে এরাজ্যে হাত ধরে ডেকে এনেছে।'' সেই লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট জেতে ৩৩টি আসনে। কংগ্রেস ১টি আসনে। তৃণমূল জেতে ৭টি আসনে। বিজেপি ১টি আসনে। সেই প্রথম বিজেপি লোকসভার কোনো আসনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আগের বারের তুলনায় ভোটও বাড়ে। তৃণমূলের 'ঐতিহাসিক' (!) অবদান।

একটা মাত্র আসন জিতলেও, ১৯৯৮ সালে তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়া বিজেপির ক্ষেত্রেও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯১-র তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ফল ছিল খুবই খারাপ। ১৯৯৬ সালে ভোটের পর কেন্দ্রে সরকার টিকিয়ে রাখতে না পারা এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ইত্যাদির কারণে ১৯৯৮ সালে বিজেপি যখন বাড়তি সমস্যায় তখনই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত অভাবনীয় স্বস্তি এনে দেয় আরএসএস-বিজেপি শিবিরে। রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষত তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বাম-বিরোধী রাজনীতির নেতিবাচক 'রূপান্তর' ঘটছিল।

'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' পত্রিকার ২৫-২৮শে অগাস্ট ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ট্রান্সফরমেশন অফ অপোজিশন পলিটিকস ইন ওয়েস্টবেঙ্গল : কংগ্রেস (আই), তৃণমূল অ্যান্ড ১৯৯৮ লোকসভা ইলেকশনস' শীর্ষক প্রবন্ধে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ জেমস মেয়ারস লেখেন : ''There is little doubt that the emergence of the Trinamul Congress, under the leadership of Mamata Banerjee has helped to provide the BJP a space in which to further its expansionist goals in West Bengal. For its part, the BJP has given Trinamul -which is essentially a regional entity — a national conduit.'' (এতে কোন সন্দেহ নেই যে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পশ্চিমবঙ্গে দলের সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে জায়গা করে নিতে বিজেপি-কে সাহায্য করে। বিজেপি তার দিক থেকে তৃণমূলের মতো একটি আঞ্চলিক সংগঠনকে জাতীয় সড়ক বাৎলে দেয়।)

তৃণমূলসহ নানা দলের জোটের মদতে ১৯৯৮ সালের ১৯শে মার্চ বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন। বলাবাহুল্য তৃণমূল ছিল বিজেপির পাশে। মমতা ব্যানার্জি নিজে কয়েক মাস আগেই 'জাগো বাংলা'-য় লিখেছেন, ১৯৯৮ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী "... সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের একটা ভূমিকা ছিল।" (মমতা ব্যানার্জির লেখা প্রবন্ধ, 'সৌজন্য', 'জাগো বাংলা' উৎসব সংখ্যা, ১৩২৫/২০১৮, পৃষ্ঠা ২-৬) দ্বিতীয় বাজপেয়ী সরকারে মমতা ব্যানার্জি মন্ত্রী না-হলেও ছিলেন রেলের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপারসন।

অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার গঠনের পরই বিজেপি-র মদতপুষ্ট তৃণমূলী সন্ত্রাস চরম হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মেদিনীপুরের কেশপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে। ১৯৯৮ সালের ৯ই এপ্রিল কেওটপাড়ায় সিপিআই(এম)-র পার্টি অফিসে সশস্ত্র হামলা চালায় তৃণমূল বাহিনী। ২২শে মে জনৈকা চম্পলা সর্দারকে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ আনেন তৃণমূল নেত্রী। সাজানো এই ঘটনা ফাঁস হওয়ায় তা নিয়ে আর তৃণমূল উচ্চবাচ্য করে না। ১৯৯৮ সালের ২৮শে মে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তৃণমূল–বিজেপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে। যদিও ভোটে বিশেষ সুবিধা তারা করতে পারেনি।

১৯৯৯ সালের ১৪ই এপ্রিল জয়ললিতার এ আই এ ডি এম-কে দল সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দ্বিতীয় বাজপেয়ী সরকারের পতন ঘটে। বহু কৌশল সত্ত্বেও আস্থাভোটে হেরে ১৭ই এপ্রিল বাজপেয়ী পদত্যাগ করেন। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকার থেকে যায় প্রায় আরও ছ'মাস।

বিজেপি-র সঙ্গে সরকারে

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ৮টি আসন পায়। বিজেপি-র আসন বেড়ে হয় ২। গতবারের চেয়ে একটি বেশি। ১৩ই অক্টোবর কেন্দ্রে শপথ নেয় তৃতীয় বাজপেয়ী সরকার। সেই সরকারে রেলমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মমতা ব্যানার্জি। তৃণমূল সাংসদ অজিত পাঁজা শপথ নেন কয়লা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পদে। বস্তুতপক্ষে বিজেপি-র পূর্ণ মদতেই ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের জায়গা থেকে সরিয়ে দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সময় পর্বে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের মধ্যেই আরএসএস-বিজেপি সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুকে খুঁজে পায়।

কলকাতা কর্পোরেশন

২০০০ সালের ৩০শে মে রাজ্যে ৭৯টি পুরসভার নির্বাচনেও তৃণমূল-বিজেপি জোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ২৫শে জুন কলকাতা কর্পোরেশন ভোট হয়। তৃণমূল –বিজেপি জোট করেই নির্বাচনে লড়ে। ১২ই জুলাই সুব্রত মুখার্জি মেয়রপদে শপথ নেন। বিজেপি-র মীনা দেবী পুরোহিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র। তৃণমূল-বিজেপি জোট পাঁচ বছর ধরে কলকাতা কর্পোরেশন চালায়। সুব্রত মুখার্জি বিধানসভায় ছিলেন কংগ্রেস সদস্য, কর্পোরেশনে তৃণমূল সদস্য। ভূ-ভারতে এ জিনিস কেউ অতীতে দেখেনি।

২০০০ সালের নভেম্বরে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের পর ৬ই নভেম্বর বামফ্রন্ট সরকারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

কেশপুর-পাঁশকুড়া

বিজেপি-র মদতে এবং কেন্দ্রের বাজপেয়ী সরকারের বলে বলীয়ান তৃণমূলের হিংস্রতার রাজনীতি অক্ষুন্ন ছিলই। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কেশপুর, গড়বেতায় যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছিল তাতেও তৃণমূলের সঙ্গে ছিল মাওবাদীরাও। 'কেশপুর সি পি এমের শেষপুর'— বলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। ২০০০ সালের ৫ই জুন মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া লোকসভা আসনের উপনির্বাচন হয়। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি-র মদত নিয়ে ভয়াবহ তাণ্ডব চালিয়ে তৃণমূল সেই উপনির্বাচনে জয়লাভ করে। পাঁশকুড়া উপনির্বাচনের এই পর্বকে তৃণমূল নেত্রী নামকরণ করেছিলেন 'পাঁশকুড়া লাইন'।

২০০১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গড়বেতার ছোট আঙারিয়া গ্রামে তৃণমূল-জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর বন্দুকবাজদের হামলার চেষ্টা ভেস্তে যায়। রাজ্যের বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০-১৪ই জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকা ধারাবাহিক সচিত্র কাহিনী ছাপে— 'হেমনগরের হত্যারহস্য'।

ঘুরপাক : বিজেপি-কংগ্রেস- আবার বিজেপি

২০০১ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের আগে ক্ষমতা দখলের নতুন অঙ্ক কষতে শুরু করেন মমতা ব্যানার্জি। ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ বাজপেয়ী মন্ত্রিসভা থেকে তিনি পদত্যাগ করেন এবং এন ডি এ না ছেড়েই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলের সঙ্গে

জোট বাঁধেন। যদিও কলকাতা কর্পোরেশনসহ পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে তৃণমূল-বিজেপি জোট যথারীতি ছিল।

তবে, তৃণমূলের সুবিধাবাদী রাজনীতি সেবার সেভাবে সফল হয়নি। বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট আবার বিজয়ী হয়। ২০০১ সালের ১৮ই মে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল আবার ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফেরে। ২০০১ সালের ২৪শে আগস্ট বি বি সি-র 'হার্ডটক ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে করণ থাপারের নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মমতা ব্যানার্জি স্পষ্ট বলেন, ''বিজেপি আমাদের স্বাভাবিক মিত্র...।'' ২০০১ সালের ২৭শে আগস্ট মমতা ব্যানার্জি ফের বিজেপি জোটে যোগ দেন।

গুজরাটের গণহত্যা এবং তৃণমূল

২০০২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগানো হয়। গুজরাট জুড়ে হিন্দুত্ববাদীরা জ্বালিয়ে দেয় দাঙ্গার আগুন। নরেন্দ্র মোদী তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ১২ই এপ্রিল গোয়ায় বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে বাজপেয়ী সরাসরি বলেন, ''মুসলিমরা যেখানে থাকেন, সেখানে তাঁরা অন্যদের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন না।''

বিজেপি জোটের অন্তত দু'টি শরিক দল মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ দাবি করলেও, মমতা ব্যানার্জি এই হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রতিবাদ করেননি। বরং তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, 'এটা বিজেপি-র অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।'

২০০২ সালের ১লা মে গুজরাট গণহত্যা নিয়ে লোকসভায় বিরোধীদের আনা সেন্সার প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে বিজেপি-জোটের দু'তিনটি দল বাজপেয়ীর পক্ষে সরাসরি না দাঁড়াতে চাইলেও, তৃণমূল যথারীতি ভোটাভুটিতে বিজেপি-র পক্ষ নেয়। মোদীর গদি ঠেকাতে বড় ভরসা হন মমতা ব্যানার্জি। বিরোধীরা বলেছিলেন, মোদীকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরাতে হবে। বাজপেয়ী এমনকি মোদীর সমালোচনাতেও তিনি নারাজ ছিলেন।

গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ২০০২ সালের ২২শে ডিসেম্বর মোদী আবার মুখ্যমন্ত্রী হন। নির্বাচনী প্রচার ছিল তীব্র সাম্প্রদায়িক বিষে ভরা। মমতা ব্যানার্জি সেই সময় ফুলের তোড়া পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

আরএসএস-বিজেপি অবশ্য তৃণমূল নেত্রীর এই অবদান ভোলেনি।

২০০৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বাজপেয়ী আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন মমতা ব্যানার্জিকে। যদিও দপ্তর দেননি দীর্ঘদিন। ২০০৪ সালের ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাজপেয়ী মন্ত্রিসভায় দপ্তরহীন মন্ত্রী ছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ক্ষমতার লোভ এতটাই যে দপ্তরহীন মন্ত্রী হলেও রাজি! ২০০৪ সালের ৯ই জানুয়ারি কয়লা ও খনি দপ্তরের মন্ত্রী হন মমতা ব্যানার্জি। বাজপেয়ী সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেই পদে ছিলেন। সেই সময় জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী অপকর্মে রাষ্ট্রীয় মদত দিয়ে গেছে বাজপেয়ী সরকার।

উদ্বাস্তু সমস্যা : তৃণমূলের কুম্ভীরাশ্রু

উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কুমীরের কান্না কাঁদছে। ২০০৩ সালে বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকারের আমলেই 'নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন' করে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে ঘৃন্যতম আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছিল। এই আইনবলে ভারতে আসার 'বৈধ কাগজপত্র' দেখাতে না পারলে উদ্বাস্তু এবং তাদের পরিবার পরিজনদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেন তারা ২০০৩ সালের আইনের পক্ষে ছিল— তৃণমূলকে জবাব দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে 'অনুপ্রবেশ'-র সমস্যা নিয়ে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার। উদ্বাস্তু সমস্যাকে তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন বাড়াতে ব্যবহার করছে। মিথ্যাচার করে বিভাজনের রাজনীতি থেকে ফয়দা তুলতে চাইছে তৃণমূল।

আর এস এস 'দেশপ্রেমিক'!

২০০৩ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে আরএসএস-এর মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'-র সম্পাদক তরুণ বিজয় সম্পাদিত 'কমিউনিস্ট টেররিজম' নামে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে মমতা ব্যানার্জি বলেন, ''কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি আপনাদের পাশে আছি। যদি আপনারা আমায় এক শতাংশ সাহায্য করেন, আমরা কমিউনিস্টদের সরাতে পারবো।'' মমতা ব্যানার্জির আহ্বানে আরএসএস স্বয়ংসেবকরা খুবই উৎসাহিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহন ভাগবত, মদনদাস দেবী, এইচ ভি শেষাদ্রির মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদী শীর্ষ নেতারা। তাঁদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, ''...আপনারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। আমি জানি আপনারা দেশকে

ভালোবাসেন...''। বিজেপি'র রাজ্যসভার সাংসদ বলবীর পুঞ্জ ওই সভাতেই বলেন, ''আমাদের প্রিয় মমতাদিদি সাক্ষাৎ দুর্গা।'' (সূত্র : দ্য টেলিগ্রাফ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩)

আরএসএস-এর অনুষ্ঠানে গিয়ে তাদের 'খাঁটি দেশপ্রেমিক' বলে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি, তা কিন্তু স্বয়ংসেবকরা ভোলেনি। ২০১৩-র ৪ঠা আগস্ট 'সঙ্ঘ পরিবার' টুইট করে জানিয়েছিল যে মমতা সেদিন তাঁদের 'প্রশংসায় পঞ্চমুখ' হয়েছিলেন! মমতা ব্যানার্জির প্রতি সঙ্ঘ পরিবারের কৃতজ্ঞতা এখনও যে ম্লান হয়নি, তার প্রমাণ ২০১৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনের পরেও তিনি আরএসএস'র 'দুর্গা'! কমিউনিস্টরা আরএসএস-র মতোই মমতা ব্যানার্জির কাছে প্রধান শত্রু। গোলওয়ালকারের সংগঠন তাঁর কাছে নিখাদ 'দেশপ্রেমিক'। কমিউনিস্ট-নিধনেও সহায়ক শক্তি।

পঞ্চায়েত ভোট ২০০৩

তৃণমূল-বিজেপি জোট ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের সময়ও তাণ্ডব চালাবার চেষ্টা করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সাহায্য নিয়ে। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে আরএসএস-বিজেপি-র ভয়ঙ্কর তৎপরতা বাড়াতে তৃণমূলের মরীয়া অবস্থান সেই সময়ও সবাই দেখেছেন। কিন্তু শক্তিশালী বামফ্রন্ট সেই নির্বাচনেও উল্লেখযোগ্য আসন পেয়ে জয়লাভ করে।

বাজপেয়ী সরকারের জনবিরোধী আর্থিক নীতিরও সমঝদার

বিজেপি মধ্যযুগীয় বীভৎসতায় সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পক্ষে, তাদের বৈদেশিক নীতি চিরকালই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ-পন্থী এবং আর্থিক নীতি পাক্কা নয়া উদারবাদী। অটলবিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় (১৯৯৮-১৯৯৯) ও তৃতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৯৯-২০০৪) সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত আর্থ-বাণিজ্যিক নীতি কার্যকর করে আরও আক্রমণাত্মকভাবে। সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাসহ বাজপেয়ী সরকারের যাবতীয় অপকর্মের শরিক মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল। বিজেপি জোটে অনেক সময়ই নানা শরিক দলের সঙ্গে বিজেপি-র নীতিগত প্রশ্নে মতভেদ হয়েছে। কিন্তু, মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস ছিল বিজেপি'র বিশ্বস্ততম সঙ্গী।

বলা বাহুল্য, মমতা ব্যানার্জি সব সময়ই জনবিরোধী নয়া উদারবাদী দাওয়াইয়ের পক্ষে। ১৯৯১ সালের জুলাইয়ে নরসিমা সরকার যখন 'নয়া শিল্প নীতি' রূপায়নের কাজে হাত দেয় তখনও মমতা ব্যনার্জি কেন্দ্রে মন্ত্রী।

বাজপেয়ী সরকার ব্যাঙ্ক ও বীমা ক্ষেত্র সংস্কারে সুদূরপ্রসারী ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছিল। সেই পদক্ষেপে পূর্ণ সায় ছিল মমতা ব্যানার্জির। নয়া উদারবাদী ন্যাশনাল টেলিকম পলিসির ক্ষেত্রে বলা যায় ১৯৯৪ এবং ১৯৯৯ সালে দু-বার টেলিকম পলিসি ঘোষণা হয়েছিল। দু-বারই মমতা ব্যানার্জি ছিলেন কেন্দ্রে শাসকদের অংশ। ১৯৯৯ সালে ছিলেন বাজপেয়ী মন্ত্রিসভার সদস্য। কোনো বিরোধিতা করেননি।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বেসরকারীকরণের সময়ও মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত সরকারের মন্ত্রী। ১৯৯১ সালে বিদ্যুৎ আইনের সময়ও মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রের সরকারে। ঐ আইন ছিল বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বেসরকারীকরণে প্রথম বড় পদক্ষেপ। ২০০৩ সালে এন ডি এ সরকার ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট এনেছিল। মমতা ব্যানার্জি তখনও সেই সিদ্ধান্তের শরিক।

১৯৯৯ সালে এবং ২০০৪ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে বিজেপি শুধু নিজের কর্মসূচি নয়, এন ডি এ-রও তরফে একধরনের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিও ঘোষণা করে। ১৯৯৯ সালে গৃহীত এন ডি এ-র অভিন্ন কর্মসূচি ছিল ''এন ডি এ অ্যাজেন্ডা ফর এ প্রাউড, প্রসপরাস ইন্ডিয়া''। ২০০৪ সালে এন ডি এ'র ইশতেহারে অভিন্ন কর্মসূচি ছিল— ''অ্যান অ্যাজেন্ডা ফর ডেভেলেমেন্ট, গুড গভর্ন্যান্স, পীস অ্যান্ড হারমোনি''।

সেই দুটি কর্মসূচিই ষোল আনা নয়া উদারবাদী। এন ডি এ-র গুরুত্বপূর্ণ শরিক হিসেবে মমতা ব্যানার্জি সেই দুটি কর্মসূচিতেই সম্পূর্ণ সহমত ছিলেন। বাজপেয়ী সরকার নয়া উদারবাদী নীতির পথে ছিল বেপরোয়া এবং খুল্লামখুল্লা। সেই সব কর্মসূচি তৈরি ও রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছিল তৃণমূলও। তৃণমূলের ভিন্নমত ছিল এমন একটি ঘটনাও কেউ উল্লেখ করতে পারবেন না।

যেমন, ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ী সরকারই প্রথম দেশের পেটেন্ট আইনের সংশোধন করেছিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তমাফিক। মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে সেই সিদ্ধান্তের শরিক। আজ 'সেজ' নিয়ে তৃণমূল বহু ভাঁওতা দিচ্ছে, অথচ, স্পেশাল ইকনমিক জোনস পলিসি বাজপেয়ী সরকারই প্রথম ঘোষণা করে ২০০০ সালের এপ্রিলে। তখন মমতা ব্যানার্জি বাজপেয়ী সরকারে রেলমন্ত্রী। তখন তো মমতা ব্যানার্জি 'সেজ' নীতির বিরোধিতা বা সমালোচনা করেননি, বরং সহমতই ছিলেন। ২০০৪ সালে এন ডি এ'র অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি বলেছিল : ''স্পেশাল ইকনমিক জোনগুলিকে

সার্বিক বৃদ্ধির বাহক হিসেবে তুলে ধরা হবে''। তৃণমূল নেত্রী তো এই কর্মসূচিরই শরিক ছিলেন।

২০০৪ সালের সেই অভিন্ন কর্মসূচিতেই এন ডি এ বলেছিল : পেনশন সংস্কার দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বলা হয়েছিল : ছ-মাসের মধ্যে ব্যাঙ্ক, বীমা, বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের বিস্তারিত কর্মসূচিও সেই কর্মসূচিতে ছিল। তৃণমূল সেই সবকিছুর সঙ্গেই সহমত ছিল।

১৯৯৯ সালে মমতা ব্যানার্জি যে সরকারে রেলমন্ত্রী সেই বাজপেয়ী সরকারই বীমা ব্যবসার ২৬ শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আইন সংসদে পাশ করায়। তখন বামপন্থীরাই তার বিরোধিতা করেছিল।

প্রথম ইউ পি এ সরকারের ওপর থেকে বামপন্থীরা সমর্থন প্রত্যাহার করার পর ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার সংসদে বীমা বিল পেশ করেছিল। বামপন্থীদের নেতৃত্বে কয়েকটি দলের প্রবল বিরোধিতায় তা পাশ করাতে পারেনি। তখন কিন্তু তৃণমূলকে বীমা বেসরকারীকরণের চেষ্টার বিরোধিতা করতে কেউ দেখেনি।

'বিলগ্নীকরণ দপ্তর' নামে একটি একটি নতুন দপ্তরই ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে বাজপেয়ী সরকার চালু করেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া তদারকি করতে। তখন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জি কোনো ভিন্নমত পোষণ করেননি। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণে ভীষণ আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানাগুলি বেচে দেওয়ার পক্ষে ভীষণ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল বাজপেয়ী সরকার। বাজপেয়ী সরকার যখন বালকো-র বেসরকারীকরণের ঘোষণা করল তখন তার বিরোধিতায় কী ছিল মমতা ব্যানার্জির ভূমিকা?

২০০০ সালের ২০ জুন বাজপেয়ী মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গের চারটিসহ (এম এ এম সি, ওয়েবোর্ড ইন্ডিয়া, ভারত প্রসেস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এবং আর আই সি) দেশের মোট ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মমতা ব্যানার্জি ছিলেন সেই মন্ত্রিসভার সদস্য।

২০১০ সালের জুন মাসে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার যখন পেট্রোলের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেয় তখনও মমতা ব্যানার্জিসহ তৃণমূল কংগ্রেসের ছ'জন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য।

গত প্রায় তিন দশকে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং বিজেপি সরকারগুলি ভীষণই আপত্তিকর সব আইন এনেছিল। এগুলির একটির ক্ষেত্রেও মমতা ব্যনার্জির আপত্তি ছিল না। বরং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদিকে নয়া উদারবাদী আক্রমণ এবং সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণার বিস্তারে বাজপেয়ী সরকারের সব পদক্ষেপ তৃণমূল কংগ্রেসেরও সমর্থন পেয়েছিল। এন ডি এ আমলেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনকে নখদন্তহীন করে দেওয়া হয়। কৃষিপণ্যে আগাম বাণিজ্যের অনুমতি দিয়ে বেআইনী মজুতদারীর সুযোগ খুলে দেওয়া হয়।

পেনশন বিলের বিরোধিতা নিয়েও তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিচারিতা করছে। বিজেপি সরকারের আমলে ২০০৩ সালের অগাস্টে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড অথরিটি গঠন করেছিল। তৃণমূল তখন কেন্দ্রে বিজেপি'র সরকারে, মমতা ব্যানার্জি মন্ত্রী। ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে নতুন পেনশন স্কীম কার্যকর করেছিল বিজেপি সরকার। মমতা ব্যানার্জি তখনও সেই সরকারের মন্ত্রী। প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমলেও চেষ্টা হয়েছিল পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড বিল এনে পাশ করানোর। কিন্তু, বামপন্থীদের প্রবল আপত্তিতে এবং স্থায়ী কমিটিতে তীব্র বিরোধিতায় তা আটকে যায়।

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের আমলে শরিকদের কোনো বাধা না পেয়ে ২০১১ সালের ২৪শে মার্চ এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় পেশ করে পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিল, ২০১১। তখন কেন্দ্রের জোট সরকারে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘর করছে তৃণমূল, মন্ত্রিসভায় স্বয়ং মমতা ব্যানার্জি। মোট সাতজন তৃণমূল মন্ত্রী। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিলের পক্ষে তৃণমূলসহ সব শরিকের সমর্থন ছিল। তারপর ২৪শে মার্চ লোকসভায় এই বিল পেশের পক্ষেই কংগ্রেস ও বিজেপি সাংসদদের সাথে হাত তুলেই সমর্থন করেন তৃণমূল সাংসদ অম্বিকা ব্যানার্জি ও গোবিন্দ নস্কর।

সিঙ্গুরে কারখানা আটকাতে তৃণমূল নেত্রী হঠাৎ করে জমি অধিগ্রহণ-বিরোধী হয়ে ওঠেন। কিন্তু জমি অধিগ্রহণে রেলের নিজস্ব আইন আছে তাতে জমির মালিক সবচেয়ে অসহায়। সেই আইনে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমি কেড়েছে রেল। তৃণমূল নেত্রীর ছিল তাতে পূর্ণ সম্মতি।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের কোন অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি পর্যন্ত ছিল না। বোঝা যায়, মন্ত্রিত্বের পদ পাওয়া ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসের

সঙ্গে কর্মসূচিগত প্রশ্নে কোন দরকষাকষির প্রয়োজনই ছিল না তৃণমূলের। বিশুদ্ধ সুবিধাবাদ!

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র তো একসময় প্রকাশ্যেই 'স্পেশাল ইকনমিক জোন পলিসি'র দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। বণিকসভা ফিকি'র মহাসচিব হিসেবে এব্যাপারে তিনি নিয়মিত মতামত দিতেন। দ্য টেলিগ্রাফের ২০১০ সালের ২৫শে জুন সংখ্যায় বা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের ২০০৭ সালের ২৩শে এপ্রিল সংখ্যার ইন্টারনেট সংস্করণ দেখলেই অমিত মিত্রের মতামত দেখা যাবে। মন্ত্রীপদে শপথ নেবার কয়েকদিন আগেও 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণের ২০১১-র ১১ই এপ্রিল সংখ্যায় অমিত মিত্র এমনকি খুচরো বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

২০০৩-র অগাস্ট। গুজরাটে কলঙ্কিত মোদী সরকারের ভাবমূর্তি ফেরানোর জন্য বণিকসভা ফিকির তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল অমিত মিত্রই দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমেরিকা, ইউরোপে গুজরাটের হয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে। নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের প্রচারের জন্য 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট, রিসার্জেন্ট গুজরাট' অনুষ্ঠানের আয়োজনেও বিরাট অবদান ছিল মমতা মন্ত্রিসভার আজকের অর্থমন্ত্রীর।

২০০৪ সালের কীর্তি

২০০৪-এও লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে আওয়াজ তোলে তখন সেই প্রচেষ্টার সার্বিক বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস তখন বিজেপি জোটে। নিজের দলের সঙ্গে বিজেপি-কে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশি আসনে জেতাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তৃণমূল।

২০০৪-র লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি-র সঙ্গেই ছিল তৃণমূল। ২০০৪ সালে ৮ই এপ্রিল নয়াদিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র লোকসভা নির্বাচনের ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। ইশতেহারে রামমন্দির নির্মাণের ঘোষণা, গোহত্যা বন্ধের মতো বিষয় লেখা হয়। আবার সরকারে এলে কয়লাখনি বেসরকারি হাতেই যাবে, সেকথাও বলা হয়। ওইদিন মঞ্চে হাজির ছিলেন এনডিএ-র ১১টি শরিক দলের মধ্যে মাত্র ৫টি দলের প্রতিনিধি। সেই ৫জনের মধ্যে একজন মমতা ব্যানার্জি। সেদিন ইশতেহার প্রকাশিত হওয়ার আগেই সম্মতি জানিয়ে তাতে সই করেছিলেন তিনি।

নির্বাচনে মানুষ আরএসএস-বিজেপি-তৃণমূল আঁতাতকে প্রত্যাখ্যান করে। ২০০৪ সালের ভোটে তৃণমূল দলের একমাত্র জয়ী প্রার্থী ছিলেন মমতা ব্যানার্জি। বিজেপি একটি আসনও পায়নি এ রাজ্যে।

‘বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ’ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী

তৃণমূল এখন মোদী সরকারের ‘নাগরিকত্ব বিল’ সম্পর্কে কুমীরের কান্না কাঁদছে। কিন্তু বাস্তবে কী মত তৃণমূলের? ২০০৫ সালের ৪ঠা অগাস্ট তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি লোকসভায় বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে স্বভাবসিদ্ধ কুৎসায় অভিযোগ করেন যে ‘বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ’-র ফলে পশ্চিমবঙ্গে নাকি ‘বিপর্যয়’ ঘটছে। তাঁর কাছে নাকি ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের ভোটার তালিকা আছে বলে তৃণমূল নেত্রী সেদিন লোকসভায় দাবি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশী নাগরিকদের নাম নাকি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় রয়েছে। তৃণমূল তখন বিজেপি জোটে।

সেদিন লোকসভায় মমতা ব্যানার্জি দাবি করেন, এব্যাপারে তাঁকে সভায় মুলতুবি প্রস্তাব তুলতে দিতে হবে। যদিও আগেই তা অধ্যক্ষ সোমনাথ চ্যাটার্জি নিয়মমাফিকভাবে খারিজ করে দেন। ক্রুদ্ধ তৃণমূল নেত্রী কাগজপত্র ছুঁড়ে মারেন অধ্যক্ষের আসনের দিকে। সারা দেশ হতবাক হয়ে যায় সভার ভিতরে এই অশালীন ব্যবহারে।

বলাবাহুল্য, আবার সাম্প্রদায়িক বিভাজনের লক্ষ্যে আনা মোদী সরকারের ‘নাগরিকত্ব বিল’ সম্পর্কে এখন তৃণমূল লোক দেখানো সমালোচনা করছে স্বভাবসুলভ সুবিধাবাদ থেকে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম তাণ্ডবে

২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপি জোট সর্বাত্মকভাবে আক্রমণ চালায় বামপন্থীদের বিরুদ্ধে। রাজ্যবাসী সেই ষড়যন্ত্র সফল হতে দেয়নি। বিপুলভাবে ভোটে জিতে আবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত হয় সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার।

কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষত কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন প্রচেষ্টাকে বিপর্যস্ত করতে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরি হয় তৃণমূলকে সামনে রেখে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-জঙ্গলমহল— সর্বত্র। সেই ষড়যন্ত্রে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তি গোপন ও প্রকাশ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। কাজে লাগানো হয় সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক শক্তিকেও।

২০০৬ সালের ডিসেম্বরে শিল্পায়ন নীতির বিরোধিতায় ধর্মতলায় তৃণমূল নেত্রীর 'অনশন' মঞ্চের কথা সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে। ২৫শে ডিসেম্বর ধর্মতলায় অনশন মঞ্চে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে দেখা করে যান বিজেপি-র তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি এবং বর্তমানে মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। ২০০৭ সালের ১০ই জানুয়ারি বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ সফর করেন নন্দীগ্রাম। ২০০৭ সালের ১৩ই নভেম্বর বিজেপি নেতা এল কে আদবানির নেতৃত্বে বিজেপি-তৃণমূল-শিবসেনা প্রভৃতি দলের একদল নেতা নন্দীগ্রামে যান বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করতে। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্বে সংসদের ভিতরে বাইরে বাম-বিরোধী ধর্মযুদ্ধে বিজেপি তার যাবতীয় রসদ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিশ্বস্ত শরিক তৃণমূলের পাশে।

আবার কংগ্রেস

নতুন পরিস্থিতিতে তাল বুঝে আবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধে তৃণমূল কংগ্রেস ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে। ইতিমধ্যে রাজ্যে কংগ্রেসকে সাংগঠনিকভাবে ভাঙতে যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছে তৃণমূল। তবুও জোট হয় এবং ফয়দা লোটে তৃণমূল। ১৯টি আসনে তারা জেতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে, যেখানে ২০০৪ সালে তৃণমূলের জিতেছিল মাত্র ১টি আসনে। ২০০৯ সালের ২২শে মে কংগ্রেস-পরিচালিত দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার শপথ নেয় ড. মনমোহন সিং-র নেতৃত্বে। মমতা ব্যানার্জি সেই মন্ত্রিসভায় রেলমন্ত্রী হন। সঙ্গে আরও কয়েকজন রাষ্ট্রমন্ত্রী।

২০১১ সালের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট পরাস্ত হয়। ২০শে মে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের জোট রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের পর নতুন ধান্ধার স্বাদ পেতে ২০১২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের হাত ছেড়ে দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে কংগ্রেসও বাধ্য হয় পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির সরকার থেকে সরে যেতে।

তৃণমূল সরকার এবং বিজেপি

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পরাজয় এবং তৃণমূল সরকার গঠনের ঘটনায় আরএসএস-বিজেপি'র তুমুল উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মতো। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আরএসএস-বিজেপি বাড়তি উৎসাহে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গে।

মোদীর টিপস ‘বিড়াল’ মারার

২০১১ সালের ১৩ই মে গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। ১৪ই মে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয় মমতা ব্যানার্জির প্রতি বিশ্বস্ত স্বয়ং সেবক গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বচন ও পরামর্শ-পূর্ণ নিবন্ধ। শিরোনাম— ‘‘প্রথম রাতেই বিড়াল মেরে দিন’’। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধেই লিখছেন জানিয়ে মোদীর উচ্ছ্বসিত পরামর্শ মমতা ব্যানার্জিকে:

‘‘আদরণীয় মমতাবেন, প্রথমেই আপনাকে আমার অভিনন্দন। আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথমেই বলি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাটা বললাম।...আপনি একজন দৃঢ়চেতা মুখ্যমন্ত্রী, আপনার বুদ্ধিমত্তা(র)...ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রশাসনে কঠোরতা খুব আবশ্যক। এই কঠোরতা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি।’’

এই পরামর্শের ধারাতেই চলছে তৃণমূল।

রাজ্যে সঙ্ঘ পরিবারের বাংলা মুখপত্র ‘স্বস্তিকা’ ২০১১-র ২৩শে মে প্রকাশিত সংখ্যায় ‘দুঃশাসনের অবসান’ শীর্ষক সম্পাদকীয়কতে লেখে: ‘‘অবশেষে দুঃশাসনের অবসান। গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া বাংলার বুকের উপর ফ্যাসিবাদী দলতন্ত্রের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছিল, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই পাথরকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। আলিমুদ্দিনওয়ালাদের যে ধরাশায়ী করা সম্ভব ইহা লইয়া অনেকেরই সন্দেহ ছিল।...যদিও কমিউনিস্টরা বিজেপি-কেই শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পয়লা নম্বর শত্রু বলিয়াই মনে করে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকার ও ক্যাডারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই নেতৃত্বে তৃণমূল জোটের এই বিরাট জয়।’’

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও বিজেপি-র সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ খোলাই রেখেছিল তৃণমূল। ২০১৩-র মে মাসে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বি জে পি প্রার্থীর নামে দেওয়াল লেখাও শুরু হয়। একেবারে শেষ মুহূর্তে দু’দলের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিজেপি প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয় তৃণমূলকে সুবিধা দিতে।।

দু’হাতেই লাড্ডু!

২০১৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ব্রিগেড ময়দানে বিজেপি-র নির্বাচনী প্রচার সভায় নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ মিলিয়ে দেখলে পরিস্থিতি বুঝতে সুবিধা

হবে। মোদী ব্রিগেডে বলেন : ‘‘বিকাশের মন্ত্র নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমাদের সুযোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গের দু-গুণ, তিন গুণ ফায়দা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের জন্য উন্নতি করবেন। কেন্দ্রে থেকে আমি এই রাজ্যের উন্নতি করব। আমাদের মাথার উপর প্রণবদা আছেন, উনিও করবেন।’’

মমতা ব্যানার্জিকে অভিনন্দন জানিয়ে মোদী আরও বলেন : ‘‘৩৫ বছর ধরে যে দল এই রাজ্যকে শেষ করেছে, সেই দলকে বিদায় করেছেন আপনি। এর জন্য অভিনন্দন জানাই’’ ব্রিগেড ময়দানের সভায় নরেন্দ্র মোদী পেশ করেন তৃণমূলের সঙ্গে রাজনৈতিক সহাবস্থানের মোক্ষম যুক্তি : “বাংলায় পরিবর্তনের সরকার এনেছেন আপনারা।... দিল্লিতে মোদীর সরকার আনুন। তারাও উন্নয়নের কাজ করবে।... আপনাদের দু’হাতেই লাড্ডু থাকবে!’’

২০১৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের সভা থেকেই বিজেপি-র তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং বলে গিয়েছিলেন, ‘‘সি পি এম বাংলার কোষাগারকে চৌপাট করে দিয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি ইউ পি এ সরকারের কাছে তিন বছরের জন্য ঋণশোধ স্থগিত রাখার যে আবেদন জানিয়েছিলেন তা কেন্দ্রের মেনে নেওয়া উচিত ছিল।’’ বিজেপি নেতা বলেছিলেন, ‘‘গ্রিসকে যদি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেল আউট প্যাকেজ দিতে পারে তবে বাংলাকে কেন দেওয়া হবে না? মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে সারা ভারতের উন্নয়নে নজর দেওয়া হবে।’’

২০১৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট পেশের দিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভাষণটি ছিল কার্যত বিজেপি-র প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা। সেই বন্ধুত্বের মাধ্যম কী হবে অস্পষ্ট রাখেননি মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যের ঋণের সুদ মকুব নিয়ে ব্রিগেডের সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত ধরে চলার যে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন বি জে পি সভাপতি রাজনাথ সিং, বিধানসভায় সেই সুরেই মমতা ব্যানার্জি গলা মিলিয়ে দেন। মমতা ব্যানার্জি বলেন, ‘‘এই সরকার (ইউ পি এ) বিদায় নিক। নতুন সরকার আসবে। তখন কথা বলে ঋণ কাঠামোর রিস্ট্রাকচার (পুনর্গঠন) করা হবে। যাতে কোনো টাকা না নিয়ে যাওয়া হয় দেখবো।’’ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘কেন্দ্রের নতুন সরকার সুদ মকুব করার পর তিন বছর সময় পাবো। তারপর, অল উইল বি গোল্ড। স্বর্ণযুগের বাংলা ফিরিয়ে আনবো।’’

আজ নয়, ঠিক সেই সময়ই মমতা ব্যানার্জি বিজেপি-র মস্তিষ্কপ্রসূত ‘ফেডারেল ফ্রন্ট’-এর পক্ষে ওকালতি শুরু করেন।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ২০১৩ সালে রাজ্যে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং শাসক তৃণমূলে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের এই কেলেঙ্কারিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ার ভূমিকা জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তাসত্ত্বেও বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য বার্তা দিতে ত্রুটি রাখেননি। তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে বিজেপি-র প্রকৃত মনোভাব এতে ধরা পড়ে।

তবে চিটফান্ড কাণ্ডে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ায় ২০১৪-র নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্র মোদী ভোটস্বার্থে সারদা তদন্ত নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। সরকারে এসেই তিনি অপরাধীদের ধরবেন, কেউ ছাড় পাবে না। টুকটাক লোকদেখানো ছাড়া আসল একটি কাজও করেননি। লাগাম টেনে রেখেছেন সিবিআই'র, ফলে তৃণমূল নিশ্চিন্তে। নির্বাচনী প্রচারে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও অনেক কথা বলেছিলেন, ভোট মিটতেই সব চুপচাপ।

ভোট মিটতেই মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে মোদীর উচ্ছ্বাসের আসল কারণটাও বেরিয়ে আসে। ২০১৪সালের ১২ই জুন খোদ লোকসভায় নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ''৩৫ বছরের বাম অপশাসন থেকে রাজ্যকে বার করে আনতে কী পরিশ্রমই না করেছেন মমতাজি!''

নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জি 'একান্ত'— বৈঠক এখন নিয়মিত ঘটনা। যেমন, ২০১৫ সালের ১০ই মার্চ দিল্লিতে একান্তে বৈঠক। ২০১৫ সালের ৯ই মে নরেন্দ্র মোদীর কলকাতা সফরকালে নজরুল মঞ্চের গ্রিনরুমে ৪০ মিনিটের উপর ফের একান্তে শলাপরামর্শ। সেদিন রাতেও রাজভবনে একান্ত বৈঠক। ২০১৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আবার একান্ত বৈঠক করেন সারদা-তদন্ত নিয়ে চাপে থাকা মমতা ব্যানার্জি। কেন একান্তে ? মন্ত্রীসভা বা দলেরও কাউকে বিশ্বাস করেন না তিনি। কী কথা হলো তা দু-জনের কেউই বিস্তারিত বলেননি। তবে এগুলি যে বোঝাপড়ার বৈঠক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২০১৫ সালের ২৩শে জুন হিন্দু মহাসভা ও বিজেপি-র পূর্বসূরী জনসঙ্ঘের প্রধান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ৬৩তম মৃত্যুদিবসও সরকারীভাবে পালন করে তৃণমূল সরকার। বিজেপি'র 'দোর্দন্ডপ্রতাপ' সভাপতি অমিত শাহ ৭ই জুলাই (২০১৫) পশ্চিমবঙ্গে দলীয় কর্মীদের জানিয়ে দেন, ২০১৬ নয়, এরাজ্যে বিজেপি-র লক্ষ্য, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন। অথচ, ২০১৪ সালের

৩০শে নভেম্বর ধর্মতলার জনসভায় তৃণমূলকে 'উৎখাতের' ডাক দিয়েছিলেন অমিত শাহ।

আগে অন্য কথা বললেও, মোদী সরকারের কথায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশের সঙ্গে 'ছিটমহল' বিনিময়েও রাজি হয়ে গেছেন। তিস্তার জল বণ্টন নিয়েও বেশ নরম। ২০১১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-র সঙ্গে ঢাকা সফরে যেতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শেষ মূহুর্তে অস্বীকার করলেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরসঙ্গী হয়ে ২০১৫-র ৫-৬ই জুন সানন্দে ঢাকা ঘুরে আসেন।

মোদী সরকারের আনা ভয়ঙ্কর জনস্বার্থবিরোধী বিলগুলিও তৃণমূল কংগ্রেস সংসদে পাশ করাতে সাহায্য করেছে। যেমন, রাজ্যসভায় কৌশলী ওয়াক-আউট করে বীমা আইন সংশোধনী বিল পাশ করাতে মোদী সরকারকে সাহায্য করে (১২ই মার্চ ২০১৫)। রাজ্যসভায় সরাসরি বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়েই কয়লা এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিলের পক্ষে ভোট দেয় তৃণমূল কংগ্রেস (২০শে মার্চ ২০১৫)। কয়লাক্ষেত্রের বিরাষ্ট্রীয়করণই ওই বিলের লক্ষ্য। তাছাড়া, ২০১৭ সালের ২৯শে মার্চ রাজ্যসভায় বিজেপি-র ও মোদী সরকারের সুবিধা করে দিতে অর্থবিল পাশ করাতে তৃণমূল ওয়াক-আউট করে। রাজ্যসভায় অর্থবিলের বিরুদ্ধে তৃণমূল ভোট দিলে তা অনুমোদন হতো না। বেকায়দায় পড়তো মোদী সরকার। কিন্তু সমস্ত বিরোধী দল ভোট দিলেও তৃণমূল অধিবেশন বয়কট করে ওই বিল অনুমোদনের সুযোগ করে দেয় বিজেপি-কে।

২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের পরও সংঘ-মুখপত্রের প্রচ্ছদ নিবন্ধের শিরোনাম ছিল— 'কমিউনিজমের শোকযাত্রায় শাপমুক্তি বাংলার'। সেখানে লেখা হয় : "...তৃণমূলের এই জয় সম্ভব হয়েছে স্রেফ জাতীয়তাবাদী ভোটের ফলে। ...জাতীয়তাবাদী ভোটাররা অনেকক্ষেত্রেই দেখেছেন যেসব জায়গায় বিজেপি দুর্বল, জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ, সেখানে ঢেলে তাঁরা তৃণমূলের পক্ষে গিয়েছেন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল গত বিধানসভা নির্বাচনে।"

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও যে অন্তত ১০০টা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা বিরোধী ভোট কেটে তৃণমূলকে সহযোগিতা করেছে, কলকাতায় এসে সেকথা বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উমা ভারতী। সমউক্তি আরও অনেকের।

বাস্তবেও দেখা গেছে। বিজেপি না থাকলে তৃণমূলের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসা যে সহজ হতো না তা মাঝেমধ্যেই বলে থাকেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তৃণমূল কখনোই তা খণ্ডন করেনি।

আরএসএস এবং তৃণমূল

আরএসএস-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বিধানসভা ভোটের আগে ২০১৫ সালের ২রা ডিসেম্বর কলকাতায় সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সভায় খোলাখুলি বলেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু করতে পারেন না যাতে কমিউনিস্টদের সুবিধা হয় বা কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ পায়।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি, আরএসএস-র অনেক ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি-র বোঝাপড়া, ভোট আদানপ্রদান হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে খড়গপুর সদর এবং ভবানীপুরের প্রসঙ্গ এসেছে। খড়গপুর সদরে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট চলে গেছে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের পক্ষে। অন্যদিকে, ভবানীপুর ক্ষেত্রে লোকসভায় জেতা থাকলেও বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র ভোটের একটি বড় অংশ চলে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। অনেক কম মার্জিনে হলেও জিততে পেরেছেন মমতা ব্যানার্জি। এমন উদাহরণ আরও অনেক রয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অপসারণ আরএসএস-র লক্ষ্য নয়। আরএসএস মমতা ব্যানার্জির 'আত্মশুদ্ধি' চায়। চায় তৃণমূল কংগ্রেসের 'রিফর্ম'। ২০১৬ সালের অক্টোবরে হায়দরাবাদে তিনদিনের জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি ব্রিগেডের সভাতেও আরএসএস-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি।

মণিপুরে বিজেপি-র পাশে

২০১৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর মণিপুরে বিজেপি-র সরকার গড়তে সমর্থন করে একমাত্র তৃণমূল বিধায়ক। আস্থাভোটে বিজেপি-কে সমর্থন করার পর ওই তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'দলের নির্দেশেই সমর্থন।' আজ পর্যন্ত সেই বিধায়ককে তৃণমূল বহিষ্কার করেনি। তৃণমূলের সমর্থনেই সরকার চলছে বিজেপি-র।

রাজ্যে বাড়ছে আরএসএস-র শাখা

রাজ্য প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় কলকাতায় আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমাবেশ করেছে রমরমিয়ে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে যে শক্তি রাজ্যে হালে পানি পেত না, তৃণমূল রাজত্বের 'অনুকূল' পরিবেশে রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে সেই আর এস এস ২৮২টি ব্লকে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

রাজ্যে ২০১১-তে যা আরএসএস-র শাখা ছিল ৩৫০টির মত। তা ছ'বছরে হয়ে যায় চোদ্দশোর বেশি। বৃদ্ধির গতি ২০১৩ সাল থেকে বেড়েছে। ওই বছর রাজ্যে শাখা ছিল ৭৮০-টি। ২০১৮-র নভেম্বরে তা পৌঁছেছে ১৪০০-তে। তার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে ৯১০টি শাখা। সপ্তাহে একদিন সদস্যরা মিলিত হয়, এমন সাপ্তাহিক মিলন কেন্দ্র রয়েছে ১০৯২টি।

বেড়েছে সঙ্ঘের অন্যান্য সংগঠনগুলিও। জেলা, ব্লক, অঞ্চল মিলিয়ে রাজ্যে এখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদেরও ১৫০০-র কাছাকাছি ইউনিট আছে। দক্ষিণবঙ্গে প্রায় ১২০০। বাকিটা উত্তরবঙ্গে। বেড়েছে বজরং দল, দূর্গা বাহিনী, বীরাঙ্গনা, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মত সংগঠনের সদস্যও।

রাজ্যে এই সাড়ে সাতবছরে সঙ্ঘের স্কুলের ঢালাও অনুমোদন পেয়েছে। রাজ্যে আরএসএস-র প্রাথমিক স্কুল আছে ৩১৪। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে আছে ১১০টি। গত দু-বছরে যে পাঁচটি বিদ্যালয় বেড়েছে— তার সবকটিই উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে স্কুল এখনও ২১৪টিই। এই সময়ে সঙ্ঘের স্কুলগুলিতে বেড়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাও। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা সহযোগিতাও করছেন। স্কুলে স্কুলে এবিটিএ-র টেস্টপেপার না কেনার ফতোয়া জারি হয়। সঙ্ঘ পরিবার মগজ ধোলাইয়ের কারখানা অবাধে বাড়িয়ে যাচ্ছে ফুরফুরে মেজাজে। তৃণমূলের এবং প্রশাসনের মদত সর্বস্তরে।

মমতা ব্যানার্জির প্রশংসায় পঞ্চমুখ

মোদী সরকারের মন্ত্রীরা পশ্চিমবঙ্গে এলেই বিগলিত হয়ে নিয়ম করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যান। যেমন, ২০১৫ সালের ১৬ই মে। রাজারহাটে এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কয়লা ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ''মমতাজীকে আমি আমার 'বড় দিদি' হিসেবেই দেখে থাকি।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতাও বলেন, ''গোয়েলজী খুবই উদ্যমী মন্ত্রী। আমি যখনই দিল্লিতে যাই, উনি আমার সঙ্গে দেখা করে বিদ্যুৎ ও কয়লা ক্ষেত্রের নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।'' পীযূষ গোয়েলের পর কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন

প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় একইমঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, ‘‘এনার্জি = মমতাজী+কয়লা। অর্থাৎ মমতাদি মানেই এনার্জি।’’

২০১৫ সালের ৯ই মে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বাবুল সুপ্রিয় আর মমতা ব্যানার্জির ‘ঝালমুড়ি’ খাওয়ার কথা তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই ঘটা করে সাংবাদিকদের জানান।

মোদী সরকারের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি গত ২০১৫ সালের ১৯শে জুন নিউইয়র্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র–ভারত বিজনেস কাউন্সিলের বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে ‘শিল্পায়ন’ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেন (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২০শে জুন ২০১৫, ইন্টারনেট সংস্করণ)।

তৃণমূলকে সন্তুষ্ট করতে ব্যাকুল অরুণ জেটলি এমনকি কলকাতায় ‘নীল রঙ’-র প্রাবল্যেও উচ্ছ্বসিত। গত ২৩শে আগস্ট (২০১৫) কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে জেটলি বলেন,‘‘আগে যখন এসেছি, তখন লাল রঙে মোড়া থাকত এই শহর। সেই সময়ে নতুন শিল্প, নতুন সংস্থা তৈরি হওয়া তো দূরস্থান, এ রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিল পুরনো শিল্পও। দেখে ভাল লাগছে, রঙের পরিবর্তনের সঙ্গে এখন বাঙালি উদ্যোগপতির জন্ম হচ্ছে এই রাজ্য থেকে।’’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে আগস্ট, ২০১৫)। জেটলি যেন মমতা সরকারের মুগ্ধ মুখপাত্র! এমনি কি জেটলির বাড়িতে পারিবারিক অনুষ্ঠানেও দিল্লি ছুটে যান মমতা ব্যানার্জি! কলকাতায় এসে রাজ্য সরকারের ঢালাও প্রশংসা করে গেছেন (১লা নভেম্বর ২০১৫) কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী উমা ভারতীও। উমা ভারতীর তৃণমূলকে খুশি-করা উক্তি, ‘‘তিরিশ বছরে যে কাজ হয়নি, তা হয়েছে গত তিন বছরে।’’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা নভেম্বর ২০১৫)

গত ১লা অক্টোবর (২০১৮) নবান্নে এসে পূর্বাঞ্চলের চার রাজ্যের প্রতিনিধিকে নিয়ে ‘ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিল’-র বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি একান্ত বৈঠকও করেন। মাওবাদী দমনে মমতা সরকারের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজনাথ সিং।

নিশ্চিন্তে তৃণমূল!

সারদাকান্ড চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি এবং নারদা ঘুষকাণ্ডে এই দুই দলের গোপন বোঝাপড়া দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন বক্তৃতায় চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে অনেক বড়

বড় কথা বলেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি, যেমন সি বি আই, ই ডি, এস এফ আই ও কি করেছে? চার বছর ধরে ক্রমাগত টালবাহানা করে এই তদন্ত বিলম্বিত করে চলেছে। তৃণমূলের দুই সাংসদ এখন জামিনে। শব্দবাদ্য নেই, 'মাথা' কবে ধরা পড়বে?

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে নারদা কাণ্ডে তৃণমূল নেতা, সাংসদ, মন্ত্রীদের নাম উঠে আসে। সাংসদদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করার কথা লোকসভার এথিক্স কমিটির, যার চেয়ারম্যান বিজেপি-র বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি। লোকসভায় নারদা স্টিং অপারেশনের টেপ জমা পড়ার পর বছর ঘুরে গেলেও কমিটির একটি বৈঠকও ডাকা হয়নি। শুধু তাই নয়, রাজ্যসভায় এথিক্স কমিটি গঠনের বিরোধিতা করেছে মোদী সরকার।

অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০০৭ সালের শেষ দিকে একটি বেসরকারী বাংলা চ্যানলের হয়ে সাজানো স্টিং অপারেশনের জেরে নন্দীগ্রামের তৎকালীন সি পি আই বিধায়ক ইলিয়াস মহম্মদ পদত্যাগ করেন। স্রেফ সেই টিভি ফুটেজের জোরেই ২০০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল বিধায়ক সৌগত রায় চিৎকার করে 'চোর' বলেছিলেন নন্দীগ্রামের সি পি আই বিধায়ককে। নারদা স্টিং অপারেশনে আরও বেশ কজন তৃণমূল নেতার মতো সৌগত রায়কেও টাকা নিতে দেখা গেছে। অথচ আজ কেউই পদত্যাগ করছেন না। এমনকি আদালত নারদার ভিডিও ফুটেজ বিকৃত নয় বলে জানানোর পরও।

বেড়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তি

মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রিত্ব পেরিয়েছে সাড়ে সাত বছর। এই সময়ে রাজ্যে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির শক্তি বেড়েছে অনেকটা। আবার সংখ্যালঘু সন্ত্রাসবাদের তৎপরতাও দেখা গেছে। বামফ্রন্ট আমলে যা ভুলে গেছিল পশ্চিমবঙ্গ, সেই সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেখা গেছে মমতা ব্যানার্জির শাসনে। বসিরহাট, আসানসোল, রানীগঞ্জ, ধুলাগড়, পুরুলিয়া, কাঁকিনাড়ার ঘটনা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রাণহানিও হয়েছে অনেকগুলি। প্রতিটি ঘটনায় হিন্দুত্ববাদীদের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের একাংশকে এই হানাহানিতে কোনও না কোনও পক্ষের হয়ে হিংসাত্মক হতে দেখা গেছে। এ তালিকা দীর্ঘ। বর্ধমানের খাগড়াগড়ের ঘটনা থেকে স্পষ্ট সংখ্যালঘু মৌলবাদী শক্তিও বাড়ছে। সেখানেও তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনের যোগ পাওয়া গেছে।

অনেক দরাজ কেন্দ্র

বামফ্রন্ট সরকারের সময়ের তুলনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নে অনেক উদার সমধর্মী কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় রাজস্বের অংশ ও গ্রান্টস্ ইন্ এইড বাবদ অর্থ অনেক বেশি পেয়েছে তৃণমূল সরকার। যেমন, ২০১২-১৩ সালে কেন্দ্রীয় করের অংশ ও কেন্দ্রীয় সহায়তা বাবদ রাজ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা এবং ২০ হাজার ২৮২ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ২৮ হাজার ২৪১ কোটি টাকা এবং ২৫ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা। দ্বিতীয়ত, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে করের অংশ বাবদ ১৬,৭১৪ কোটি টাকা এবং গ্রান্টস্ ইন্ এইড থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা এবং ৮৩৮৬ কোটি টাকা। প্রাপ্তির মাপকাঠিতে উত্তর প্রদেশের পরই এই রাজ্যের স্থান। (সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ১৪-১৫, খণ্ড ১, পৃ: ১৩২ ও ১৩৪)

ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের যোগানো তহবিলের পরিমাণ বাড়ছে তৃণমূল সরকারের জন্য। এমনকি সব বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারও মোদী সরকারের কাছ থেকে এমন উদার ঢালাও সাহায্য পায়নি। ১০০ দিনের কাজ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও, এমনকি বিজেপি সমর্থকরা করলেও মোদী সরকার সেই সব অভিযোগ খতিয়েও দেখেনি, ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা।

রাষ্ট্রপতি পদে আদবানির পক্ষে সওয়াল

২০১৭ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে (২৩শে মার্চ) মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করা হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থীপদ নিয়ে। জবাবে মমতা ব্যানার্জি বলেন, "লালকৃষ্ণ আদবানি, সুষমা স্বরাজ, সুমিত্রা মহাজন বা প্রণব মুখোপাধ্যায় যে কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। এই বিষয়ে এখনও কিছু বলার সময় আসেনি।" একইসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, ''আমি লালকৃষ্ণ আদবানি এবং সুষমা স্বরাজকে শ্রদ্ধা করি। তাঁদের কেউ রাষ্ট্রপতি হলে আমি খুশিই হব।'' এরপরেই তিনি বলেন, ''প্রণবদা আবারও রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন। প্রণব মুখোপাধ্যায় হলেও আমি খুশি হব।'' প্রসঙ্গত, প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন রাষ্ট্রপতিপদেই ছিলেন।

‘আর এস এস’– আগে নাকি ছিল ‘ভালো’

মমতা ব্যানার্জি কি আরএসএস-কে ভুলতে পারছেন না? কলকাতার মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদেশে গত ২৮শে আগস্ট (২০১৮), তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি বলেন, আরএসএস ‘আগে’ ভালো ছিল।

‘আগে’ বলতে মুখ্যমন্ত্রী কী বোঝাচ্ছেন বোঝা শক্ত। যখন তিনি ২০০৩ সালে আর এস এস নেতাদের প্রকাশ্য সভায় গিয়েছিলেন তখন, না তারও পরে, তা স্পষ্ট করেননি। বাস্তবে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আরএসএস কখনও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত থাকেনি। গান্ধিজীর খুনির ভাই গোপাল গডসে স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁরা বরাবর আরএসএস-র সক্রিয় কর্মী ছিলেন। গান্ধী হত্যার পর আর এস এস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

বিধানসভায় বোঝাপড়া

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও বিজেপি প্রায় নীরব থেকে তৃণমূল সরকারের সুবিধা করে দিচ্ছে। বিধানসভায় সরকারের প্রায় সমস্ত অপকর্ম সম্পর্কে বিজেপি হয় নীরব থেকেছে, নয় সমর্থন জানিয়েছে। বিরোধী দলের আনুষ্ঠানিক ভূমিকাটুকু পালন করতেও তারা নারাজ। রাজ্যপালও রাজ্য সরকারের সব কাজেই সিলমোহর দিচ্ছেন।

তৃণমূল সরকারের স্বৈরাচার সম্পর্কে, দলদাস প্রশাসন সম্পর্কে বা নজিরবিহীন দুর্নীতি নিয়ে কোনো কথাই রাজ্যপালের মুখ থেকে শোনা যায় না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবেরই প্রতিফলন।

হিন্দুত্ব : বিজেপি বনাম তৃণমূল

রামনবমী ২০১৭ : ২০১৭-র ৫ই এপ্রিল। ‘রামনবমী’ পালনের অজুহাতে কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্নস্থানে আইনের তোয়াক্কা না করে সশস্ত্র মিছিল সংগঠিত হয়, অংশগ্রহণকারী মহিলা ও শিশু কিশোরদের হাতেও অস্ত্র ছিল। বহুস্থানে বিজেপি, আরএসএস-র লোকজনের সঙ্গে তৃণমূল নেতারাও হৈ হৈ করে ‘রামনবমী’-র মিছিলে অংশ নেন। খড়গপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের পাশে ছিলেন খড়গপুর পৌরসভার তৃণমূলী চেয়ারম্যান প্রদীপ সরকার। (বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ)

হনুমানজয়ন্তী : ১১ই এপ্রিল ২০১৭। ‘হনুমান জয়ন্তী’কে সামনে রেখে

প্রায় একই চিত্র দেখা যায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। হাওড়ায় 'হনুমান জয়ন্তী'র মিছিলে অংশ নেন তৃণমূল সরকারের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বেলিলিয়াস রোডে হনুমান মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় হাওড়া পুর নিগমের তৃণমূল মেয়র ডা: রথীন চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উপস্থিতিতে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কাউন্সিলর-বিধায়করা দাঁড়িয়ে থেকে হনুমান পুজো করান। বীরভূমজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় হনুমান পুজোর আয়োজন করে শাসক তৃণমূল দল। সকল শালীনতা সংহারক অনুব্রত মণ্ডল সবিক্রমে হনুমান পূজোয় অংশ নেন সিউড়িতে। খুশি আরএসএস-বিজেপি ।

'যজ্ঞ' করছে তৃণমূল : ২০১৭ সালের ২৯শে এপ্রিল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বীরভূমের কঙ্কালীতলায় কঙ্কালীদেবীর পুজো ও যজ্ঞ করা হয় অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে। ১১ জন পুরোহিত যজ্ঞ করেন। সাংবাদিকদের কাছে অনুব্রত মণ্ডল জানান, কঙ্কালীতলার যজ্ঞে নাকি 'সংকল্প' হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও।

'পুরোহিত সম্মেলন' : ২০১৮ সালের ৮ই জানুয়ারি। ''আমরা কারো কাছে হিন্দুত্ব শিখব না'' ঘোষণা করে বীরভুম জেলায় বোলপুরের ডাকবাংলো মাঠে জেলার ১১টি বিধানসভা ও বর্ধমান জেলার তিনটি বিধানসভা এলাকা থেকে প্রায় দশ হাজার পুরোহিত নিয়ে 'পুরোহিত সম্মেলন'-র আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের বাহুবলী নেতা অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও সম্মেলনে তৃণমূল সরকারের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরীও অংশ নেন। অনুব্রত মণ্ডল মাইকে ঘোষণা করেন, ''এ রকম সম্মেলন আমি অনেক করি। কখনো সংখ্যালঘু সম্মেলন— কখনো বা আদিবাসীদের নিয়ে সম্মেলন। আর এটা তো অন্য কারণে করলাম। দেখছেন তো বর্তমান প্রজন্ম পৌরোহিত্য করতে বা মৌলবি হতে চাইছে না। এদের এই অনীহা আমাদের ভবিষ্যতকে বিপদের মুখে ফেলতে পারে। তারা যদি এগিয়ে না আসে তাহলে আমাদের সামজিক আচার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আজকের সম্মেলন।''

সম্মেলনে হাত জোড় করে পুরোহিতদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''আপনারা ধর্মজ্ঞানী। আপনারা যা বলবেন, যা বলেন, তাই আমরা পালন করি। আপনারা আরো পুরোহিত তৈরি করুন।... আপনাদেরই ধর্মকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেতে হবে।...আপনারা জানেন হিন্দু ধর্ম কী।''

সম্মেলনে হাজির পুরোহিতদের নামাবলী, পৈতে, গীতা ও রামকৃষ্ণ কথামৃত দেওয়া হয়। (আজকাল, ৯ই জানুয়ারি ২০১৮) তৃণমূল নেতারা পুরোহিতদের গাভী দেওয়ার কথাও বলেন। তবে তা নাকি সম্মেলনের দিন নয়, পরে দেওয়া হবে।

দক্ষিণেশ্বরেও পুরোহিত-সভায় তৃণমূল মন্ত্রী : ২০১৮ সালের ১০ই জানুয়ারি। বীরভূমের পর দক্ষিণেশ্বরেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট আয়োজিত সভায় উপস্থিত হন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সেচমন্ত্রীর কাছে, ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের নেতৃত্ব পুরোহিত ভাতা-সহ ন'দফা দাবি পেশ করেন। ব্রাহ্মণদের মাসিক ভাতার দাবির পাশাপাশি, গৃহহীন ব্রাহ্মণদের গৃহের ব্যবস্থা, জেলাগুলিতে সংস্কৃত কলেজ গড়ার দাবিও উঠেছে।

রামনবমী নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি প্রতিযোগিতা

২০১৭-র পর ২০১৮। ২০১৮-র ২৫শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে দেখলো 'রামনবমী' পালন নিয়ে কেন্দ্রের শাসক আরএসএস-বিজেপি এবং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বোধ প্রতিযোগিতা। রামের নামে তাণ্ডব চলেছে রাজ্যজুড়ে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা, আদালতের নির্দেশ ফুৎকারে উড়িয়ে মাইক, বক্স, ডি জে বাজে তারস্বরে।

রাজ্যের অনেক জায়গাতেই তরবারি, কুঠার, বড় কাটারি, গদা, ত্রিশূলের মতো অস্ত্র নিয়েই মিছিল করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে 'রামনবমী'-র শোভাযাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সৌরভ চক্রবর্তী আর বিজেপি নেতা কুশল চ্যাটার্জি পাশাপাশি হাঁটতে থাকেন। দুই দলের নেতা, কর্মীরা মিশে যান শোভাযাত্রায়। তমলুকে শোভাযাত্রায় অংশ নেন পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কাঁথিতে আবার 'জয় শ্রী রাম' লেখা নীল ফেট্টি বেঁধে পথে নেমেছেন তৃণমূল সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। রামপুরহাট পুরসভা এলাকার ভাঁড়শালায় রাম সীতার মূর্তিতে পুজো করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষিমন্ত্রী বলেন, ''গতবার হনুমান জয়ন্তী পালন করেছি। এবার যাতে সমস্ত রামভক্তরা রামনবমী পালন করতে পারেন তার জন্য তৃণমূল তার সমস্ত সমর্থন দিয়েছে রামনবমী উদ্‌যাপন কমিটিকে।''

উত্তর ২৪ পরগনার কাঁকিনাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে দেখা যায় অস্ত্র। সেই মিছিলে ছিলেন শাসকদলের স্থানীয় বিধায়ক অর্জুন সিং। সশস্ত্র শোভাযাত্রার পরে কাঁকিনাড়ায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়।

২৬শে মার্চ রাণীগঞ্জে রামনবমীর মিছিল ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বোমার আঘাতে আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসি সদর অরিন্দম দত্ত চৌধুরী মারাত্মকভাবে জখম হন। তৃণমূল পরিচালিত আসানসোল কর্পোরেশন এবার রামনবমী পালনের জন্য ১৫০টি সংগঠনকে পাঁচ হাজার করে টাকা দেয়। তৃণমূল এবং বিজেপির নেতারা মিলেমিশেই বিভিন্ন জায়গায় রামসীতার মন্দির তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছেন।

রামনবমীর দিন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বলি হয় আসানসোলের একটি মসজিদের ইমামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সন্তান। পুত্রশোকের মধ্যেও ইমাম শহরে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আবেদন জানান। (বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন থেকে সংকলিত)

২০১৮ সালে ৩১শে মার্চেও হনুমানজয়ন্তী পালন নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে তৃণমূল এবং বিজেপি।

২৮ হাজার পূজা কমিটিকে ১০ হাজার করে টাকা

মমতা সরকারের সাম্প্রতিক কীর্তি পুজো কমিটিগুলিকে সরাসরি সরকারী অর্থ দিয়ে সাহায্য। ২০১৮ সালে রাজ্যের ২৮ হাজার দূর্গা পূজা কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে অনুদান এবং ওয়েভার লাইসেন্স ফি মকুব করে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

সম্প্রতি আয়কর দপ্তর কিছু ডাকসাইটে পুজো কমিটির আয়ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইলে মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেন, পুজো কমিটিগুলি যেন আয়কর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা না করে। ভূ-ভারতে অন্য কোনো মুখ্যমন্ত্রী আয়কর কর্তৃপক্ষের আইনী অধিকারকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করেননি। মমতা ব্যানার্জি পুজো সম্পর্কে ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক পুঁজি করতে সর্বদাই তৎপর।

‘শ্রী রাম’ বনাম ‘মা দুর্গা’ : বিজেপি-কে ‘রোখা’র অদ্ভুত এক দাওয়াই বাংলার মানুষকে শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। গত ২৬শে নভেম্বর (২০১৮) জামবনিতে সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি বলেন, ‘ওদের শ্রী রাম থাকলে, আমাদের মা দুর্গা আছে। মা দুর্গার পুজো খোদ শ্রী রামচন্দ্রই করেছিলেন।’ দুর্গা ঠাকুর কবে থেকে তৃণমূলের সম্পত্তি হলো কে জানে? কেনই বা দুর্গা ঠাকুর তৃণমূলের হয়ে লড়ে যাবেন ‘শ্রী রাম’-র সঙ্গে, তাও কেউ জানে না!

মমতা প্রধানমন্ত্রী হলে রাম মন্দির হবে

দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রমের প্রধান পুরোহিত জ্ঞানদাস মোহন্তের খুব ভরসা মমতা ব্যানার্জির ওপর। গত ২৬শে ডিসেম্বর (২০১৮) কপিলমুনির আশ্রমে সফররত মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে জ্ঞানদাস বলেন, ''দিদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের কল্যাণ হবে। দিদির মতো কেউ প্রধানমন্ত্রী হলে রাম মন্দির নির্মাণও হবে। ভারতের সাধু সন্তরা রাম মন্দির চান।'' মুখ্যমন্ত্রী নিজে বা তাঁর দল অবশ্য মোহন্তর কথার কোনো প্রতিবাদ করেননি, বরং বোধ হয় খুশিই হয়েছেন।

মমতাকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান দিলীপ ঘোষ

গত ৫ই জানুয়ারি (২০১৯) ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সেই দিনেই কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, ''ওনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর সাফল্যের উপরে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নির্ভর করছে। উনি সুস্থ থাকলে বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাবনা রয়েছে। ওনার কাছে সে সুযোগ আছে।তাই ওনার সুস্থ থাকা প্রয়োজন ।'' বলাবাহুল্য, বিজেপি রাজ্য সভাপতি আসলে সঙ্ঘ পরিবারের মনের কথা বলেছেন। সম্মতিসূচক নীরবতা দেখা যায় মমতা ব্যানার্জি ও তৃণমূলের।

মমতা ব্যানার্জি, বিজেপি এবং 'সৌজন্য'

তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র ২০১৮ সালের (বঙ্গাব্দ ১৪২৫) উৎসব সংখ্যায় (শারদীয় সংখ্যা) মমতা ব্যানার্জি লেখা একটি প্রবন্ধ পাঁচ পাতা জুড়ে ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনাম 'সৌজন্য'। স্মৃতিচারণামূলক লেখা। রাজনীতিতে 'সৌজন্য' ইত্যাদি নিয়ে নানা মন্তব্য উপদেশ। 'সৌজন্য' প্রসঙ্গে বলেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কথা। আসলে বাজপেয়ী সরকার এবং সেই সরকারে তৃণমূলের অংশীদারিত্ব নিয়ে কিছু কথা তৃণমূল নেত্রী সাজিয়ে রেখেছেন এই প্রবন্ধে।

মমতা ব্যানার্জি এই লেখায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন ১৯৯৮ সালের মার্চে বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় তৃণমূলের অবদান নিয়ে। মমতা ব্যানার্জি লিখছেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী ''...প্রথম যখন প্রধানমন্ত্রী

হন তখন তার সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের একটা ভূমিকা ছিল।''(পৃষ্ঠা ৩)

কেন বিজেপি-কে সরকার গড়তে সাহায্য করেছিলেন? ঠিক আগের বাক্যটি এরকম ভাষায় : ''আজ তিনি বেঁচে নেই। কিন্তু মানুষটার অকপট হাসিমুখটা কখনও ভুলতে পারি না।'' চারটি বাক্য পরে লেখা : ''..অটলজীর সরকারকে আমরা নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছিলাম। শুধু মাত্র ওই মানুষটির দৃপ্ত রাজনৈতিক চেহারা দেখে এই সমর্থন আমরা দিই।'' (পৃষ্ঠা ৩-৪)

লেখার মধ্যে তৃণমূল নেত্রীর আরও দুটি বার্তা রয়েছে বাজপেয়ীর নাম টেনে। যেমন,বাজপেয়ী ''...কোনওদিন কোনও অসম্মানজনক কথা আমাদের বলেননি'' এবং ''...উনি আমাকে বুঝতে পারতেন, এটাই তো বড় কথা।'' (পৃষ্ঠা ৫)

প্রবন্ধের শেষ দিকে এখনকার 'কিছু ভুঁইফোঁড় নেতা' সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ করে তৃণমূল সুপ্রিমোর মন্তব্য: ''..মনে হয় রাজনৈতিক সৌজন্যের হাতেখড়ি পাঠ এদের হয়নি।... সৌজন্য শেখার পাঠ এদের অটলজীর কাছে নেওয়া দরকার।'' (পৃষ্ঠা ৬)

বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে— নীতি নয়, কর্মসূচি নয়— 'সৌজন্য'ই বিজেপি-র সঙ্গে তৃণমূলের সেই সম্পর্কের নির্ধারক। 'সৌজন্য'পেলে বিজেপি-র হাত ধরতে এখনও বা অন্যথা হবে না।

গরিব সংখ্যালঘুদের জন্য আসলে কিছুই হয়নি

তৃণমূল নেতানেত্রীরা 'রামনবমী' / 'হনুমানজয়ন্তী' উদযাপনের পাশাপাশি মেরুকরণের রাজনীতি শুরু করে দেন ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা নিয়ে ব্যাপক ঢাক পিটিয়ে। আগে অনেক মায়াকান্না কাঁদলেও ক্ষমতায় এসে সংখ্যালঘু মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের জন্য প্রকৃত কোনো কাজই তারা করেনি। শিকেয় তুলে রেখেছে সাচার কমিটির সুপারিশ। সংখ্যালঘুরা এখন প্রতারিত।

সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের জন্যে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, ভূমিসংস্কারে প্রভূত সহায়তা, মুসলিম মহিলাদের সুযোগ বাড়ানো— এককথায় সমাজের সমষ্টিগত উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে জোর দেওয়া ছিল বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রাধিকার।

বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশে ঐতিহাসিক উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এই শিক্ষাকে আধুনিক এবং বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার চেষ্টা করে বামফ্রন্ট সরকার। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন ও অবসরকালীন পেনশনের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই নেওয়া হয়। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বামফ্রন্ট সরকারেরই প্রতিষ্ঠিত।

এর আগে অনেক মায়াকান্না কাঁদলেও ক্ষমতায় এসে সংখ্যালঘু মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের জন্য প্রকৃত কোনো কাজই তারা করেনি। সংখ্যালঘুরা এখন প্রতারিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ২০১১ সালের ১১ই জুন বলেছিলেন, তৃণমূল সরকার রাজ্যে দশ হাজার মাদ্রাসা খুলবে। কাজে কিছুই করেননি। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে রাজ্যে মাদ্রাসা ছিল ৬০৫টি। ২০১৭-তে তা দাঁড়িয়েছে ৬১৪-তে। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কাজও হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিগম একটানা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে দেশের মধ্যে সেরা কাজের জন্য। ২০১২-র ১০ই অক্টোবরে কলকাতায় তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ছিল, সংখ্যালঘুদের জন্য ৫৬টি মার্কেটিং হাব তৈরি হবে। সেগুলিতে নাকি প্রায় ছাপান্ন হাজার সংখ্যালঘু ছাত্রদের কাজের বন্দোবস্ত হবে। কোথায় মার্কটিং হাব? কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা-ঋণ দেওয়ার পরিমাণও। ২০০৫-০৬ থেকে চালু হওয়া 'স্টেট গভর্নমেন্ট স্টাইপেন্ড' প্রকল্পটি তৃণমূল সরকার ২০১১-১২-তে বেমালুম তুলে দিয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করা সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ঐ প্রকল্পে ভাতা দেওয়া হতো।

চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে এখন মাদ্রাসার শিক্ষকরা কলকাতায় ফুটপাতে অনশন করলে রাজ্য সরকার ফিরেও তাকাচ্ছে না। তৃণমূলের ২০১১-র নির্বাচনী ইস্তেহারে অবশ্য মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতির কথা লেখা আছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য 'উন্নত' ও 'বিশেষ' বেতন কাঠামো করবে বলেছিল। সংখ্যলঘুদের চাকরিতে 'বিশেষ প্রাধান্য' দেওয়া হবে বলছিল। কিছুই হয়নি।

সংখ্যালঘুদের 'ও বি সি' হিসাবে সংরক্ষণের ঐতিহাসিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বামফ্রন্ট সরকারই। তখন তৃণমূল বাধা দিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস

বহু বছর কেন্দ্রে সরকারী ক্ষমতা ভোগ করলেও, মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রে বহু বছর মন্ত্রী থাকলেও সংখ্যালঘুদের জন্য সরকারী চাকরিতে পদ সংরক্ষণের কথা ভুলেও কখনও মুখে আনেননি। এখন এমনিতেই চাকরি বাকরি নেই। শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমাগত পিছোচ্ছে। সরকারী চাকরিতে স্থায়ী পদে নিয়োগ গত সাড়ে সাত বছর ধরে বন্ধ। তারই মধ্যে ও বি সি হিসেবে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের যে সুযোগ বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছিল তা ক্রমাগত সংকুচিত করে চলেছে তৃণমূল সরকার।

সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে অস্বীকার করে কেবল কতিপয় ধর্ম-ভিত্তিক পরিচয়কে ব্যবহার করে কিছু ব্যক্তিগত সুবিধাভোগী বানানোর ছকের ফলে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি দারুণভাবে উৎসাহিত। সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার বোঝাপড়ায় তৃণমূল সরকার 'মুসলিম তোষণকারী' এটা প্রচার করে আরএসএস-বিজেপি গোটা পশ্চিমবঙ্গে জিগির তুলছে।

মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত মহিলারা দাবি তুললেও, এমনকি আদালত পর্যন্ত গেলেও, সুবিধাবাদী তৃণমূল অস্বস্তি এড়াতে তিন তালাক প্রসঙ্গে কৌশলী অবস্থান নিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ যত বাড়বে তত ফয়দা— তৃণমূল ভোটের অঙ্ক কষছে।

বিজেপি ও তৃণমূল পরস্পরের পরিপূরক

গত ১৯শে জানুয়ারি কয়েকটি রাজ্য থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে আমন্ত্রিত বক্তা রেখে তৃণমূলের ব্রিগেডে সভায় এমন কয়েকজন ভাষণ দেন যাঁরা কিছুদিন আগেও বিজেপি'র বড় নেতা বা কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং এখনও বিজেপি ছাড়েননি, যদিও হয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থে এই মুহূর্তে মোদীর ব্যাপারে কিছুটা বিরূপ। বিজেপি-র অরুণ শৌরি, যশবন্ত সিনহা, শত্রুঘ্ন সিনহা, গেগঙ আপাঙ-র কথাই ধরুন। আরএসএস-বিজেপি-র সঙ্গে নীতিগত বা মতাদর্শগত কী কোনও বিরোধ রয়েছে এঁদের? এঁরা নিজেরা কখনো বলেছেন? মতপার্থক্য যদি কিছু থাকে তা তো পদপ্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে, যা তৃণমূলেরও!

রাজ্য প্রশাসন এবং অনুগত মিডিয়াকে ব্যবহার করে 'ধর্মনিরপেক্ষতার অবতার' সাজার এই নবতর কৌশল তৃণমূল কংগ্রেস দল এবং তার সুপ্রিমোর

বহুরূপী ভণিতার সাম্প্রতিকতম নজির। আরএসএস-বিজেপি-র মতো দেশের মানুষের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত লড়াই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তৃণমূলী অপকৌশলকে ব্যর্থ করতে হবে। আসলে বিজেপি ও তৃণমূল স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে পরস্পরের পরিপূরক।

●

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং তার মোকাবিলার বিষয়টি গত আড়াই দশকের ওপর নয়া উদারবাদ পর্বের প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা পেয়েছে। শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকারও রদবদল ঘটেছে।

নয়া উদারবাদ কাঠামোগতভাবে রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক ভূমিকাকে অস্বীকার করে। বাস্তবে যার অর্থ, সমাজের একেবারে উচ্চস্তরে থাকা সুবিধাভোগী ও বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থপূরণ এবং আর্থিক সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর স্বার্থপূরণে অস্বীকার।

পুঁজিবাদের স্বাভাবিক সংকটগুলি নয়া উদারবাদ পর্বে আরও দ্রুত বাড়তে থাকে। দারিদ্র, কর্মহীনতা বেড়েই চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক পরিকাঠামোর মতো সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী জরুরী বিষয়গুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। সামাজিক বৈষম্যের ক্রমবৃদ্ধি নয়া উদারবাদী শাসনের স্বাভাবিক পরিণতি।

গত ২১শে জানুয়ারি (২০১৯) দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক অধিবেশনের আগে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অক্সফ্যাম' প্রকাশিত তথ্য বলছে, ভারতে মাত্র ১ শতাংশ মানুষ ৫১.৫৩ শতাংশ সম্পদের অধিকারী। একেবারে শেষধাপের ৬০ শতাংশ মানুষ দেশের মাত্র ৪.৮ শতাংশ সম্পদের মালিক। বৈষম্য বাড়ছে দ্রুততর হারে।

নয়া উদারবাদী ব্যবস্থায় সমাজের অতিসামান্য অংশ উপকৃত। নয়া উদারবাদে সুবিধাভোগী হিসেবে গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্তের একাংশ নব্য ধনীতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলায় ক্রমশ আরও বেশি বেশি মানুষ সংকটের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

নয়া উদারবাদী কর্মসূচীতে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে যে সরকার, তার এই চরম অসাম্য নাগরিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওপর চাপিয়ে দিতে গেলে সেই সরকারের স্বাভাবিক পরিণতি উগ্র দক্ষিণপন্থা। দক্ষিণপন্থা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, প্রসারিত হচ্ছে, আগ্রাসী রূপ ধারণ করছে।

●

নয়া উদারবাদী কাঠামোয় শাসকশ্রেণীর সংকট যত বাড়ছে তত তাদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে প্রচলিত গণতান্ত্রিক কাঠামো, সংবিধানিক রীতিনীতি, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক মিডিয়ার স্বাধীনতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার, প্রচলিত নাগরিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের মতো বিষয়গুলি। গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দাবি দাওয়া এবং বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় স্তরে শাসকশ্রেণীর অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। নয়া উদারবাদ কাঠামোগতভাবেই গণতন্ত্র মানে না বলেই সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ে নাগরিক সচেতনতাতে স্বস্তি বোধ করে না। মানুষকে বিপদগামী করতে নৈতিকতা, গণতান্ত্রিক মানসিকতা, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক জগতেও চালানো হয় নয়া-উদারবাদী আক্রমণ। এই বিপদ বাড়ছে। সমাজ-বিমুখতা এবং সংগঠিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে বিমুখতা তার পছন্দসই। সাম্রাজ্যবাদের বিপদ সম্পর্কে সে পরিকল্পিতভাবে উদাসীন। বামপন্থা তাদের স্বাভাবিক প্রতিপক্ষ, শত্রু।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি— যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নির্বাচন কমিশন, ভিজিলেন্স কমিশন, সি এ জি, সি বি আই, মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন, দুর্নীতি তদন্তে লোকায়ক্ত, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইউ পি এস সি ইত্যাদি— কোনটাই রেহাই পাচ্ছে না। এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্বশাসন গুরুতরভাবে আক্রান্ত। এদের মাথায় বসানো হয় আরএসএস-এর লোকদের। বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা সম্পর্কে এদের অসহিষ্ণুতা এবং প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীদের উক্তি ইত্যাদি প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। রাজ্যপালের পদের অপব্যবহার হচ্ছে নির্লজ্জভাবে। কর্পোরেটদের সেবা, উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি বিপজ্জনক ও নজিরবিহীন স্বৈরতান্ত্রিক পথে মোদী সরকার আগ্রাসী অভিযান শুরু করেছে।

●

পাঁচ বছরে প্রতিশ্রুতিরক্ষার চরম ব্যর্থতার সামনে নয়া উদারবাদী, সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরতন্ত্রী মোদী সরকারকে ঐক্য ও সংহতিকে ভাঙার জন্য নিত্যনতুন দাওয়াই বার করতে হচ্ছে। কাশ্মীরে জওয়ানদের ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলকে কেন্দ্র করে ফেব্রুয়ারি মাসে ভোটের স্বার্থে তাদের উগ্র জাতিয়তাবাদের আবহাওয়া তৈরি সর্বশেষ দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এটা তাদের দেউলিয়াপনা, তবে এতে সংকট নিরসনের প্রশ্নই নেই, বরং তা বাড়ছে।

নয়া উদারবাদ বিরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ায় উৎসাহ যোগায়। বনধ ডাকলে

বৃহৎ পুঁজি-পরিচালিত মিডিয়া চিলচিৎকার শুরু করে অর্থনীতির 'ক্ষতি' হওয়ার ধুয়ো তোলে। মমতা ব্যানার্জিরা বলেন, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে বনধ কী দরকার, 'হনুমানজয়ন্তী'র ছুটি না হয় দু'দিন বাড়িয়ে দেবো!

গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার বদলে নয়া উদারবাদী আগ্রাস রূপকার মোদী সরকার নির্ভর করে নির্লজ্জ মিথ্যাচার, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, নাগরিক সমাজকে নিত্যনতুন পন্থায় প্রতারণা, রাষ্ট্রীয় তহবিল ভাঙিয়ে নির্লজ্জ প্রোপাগান্ডা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলির ওপর বেলাগাম আক্রমণের ওপর। এর সঙ্গেই যুক্ত কর্পোরেটদের সর্বোচ্চ মুনাফা, কালো টাকার স্রোত, উচ্চস্তরে অবাধ দুর্নীতি, বিদেশিদের স্বার্থ পূরণের রাস্তা প্রশস্ত করা। সবটাই কেন্দ্রে ও রাজ্যে পূর্ণমাত্রায় চলছে।

●

নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন তার জরুরী প্রয়োজনেই সমাজে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার উপাদান খোঁজে এবং সেই উপাদানগুলিকে লালন করে। তাই, 'তথাকথিত উত্তর আধুনিকতা'র মতোই জনগোষ্ঠীকে শ্রেণী-রাজনীতিবিরোধী বিভাজনকামী পরিচয়ে খণ্ড খণ্ড করার বিপজ্জনক পদক্ষেপে সরকার তৎপর। বিভেদপন্থী 'পরিচিতি সত্ত্বা'র রাজনীতি প্রবলতর হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রয়োজনে। জাতপাত, ধর্ম বর্ণ ছাড়াও বিরোধ বিদ্বেষ সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রও, বিভেদকামী 'পরিচিতি সত্তা'কে এজন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। জাতপাতের সংকীর্ণতা, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ, আজকের নয়া উদারবাদ পর্বে নতুন রূপ নিয়েছে। যত তার সংকট বাড়ছে গণঅসন্তোষ ও গণপ্রতিবাদকে চাপা দিতে তত সে হিংস্রতর উপায়ে বিভেদ-বিদ্বেষ-বিভাজনের নিত্য নতুন উপাদান খুঁজছে।

●

১৯৯১ সালে কংগ্রেস সরকারের হাত ধরে নয়া উদারবাদী নীতিসমূহ কার্যকর করা শুরু হলেও গত শতকের শেষ দিক থেকে শাসকশ্রেণী বিজেপি-র মধ্যেই বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি খুঁজে পেতে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের শাসকশ্রেণীর প্রধান রাজনৈতিক দলের ভূমিকায় উঠে এসেছে আরএসএস পরিচালিত বিজেপি। জাতীয় কংগ্রেসকে সরিয়ে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে থাকতেই দেশের বৃহৎ কর্পোরেট অধিপতি এবং চেম্বার অফ কমার্সগুলি কীভাবে 'গুজরাট গণহত্যার' কলঙ্ক

ভুলিয়ে মোদীকে ‘সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী’ হিসেবে তুলে ধরেছিল, আমেরিকা কিভাবে কঠোর অবস্থান থেকে গলে গেল তা সবারই নিশ্চয়ই মনে রয়েছে।

●

নয়া উদারবাদী নীতি শুধু মোদী সরকার নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলোও জোরজবরদস্তি কার্যকর করছে। আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্বকারী মূলত রাজ্যভিত্তিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলিও বৃহৎ একচেটিয়া বুর্জোয়াদের নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে। আরএসএস-বিজেপি’র সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতপাতবর্ণভিত্তিক রাজনীতির প্রশ্নে প্রায়শই তারা আপোসমুখী, সমঝোতামূলক ও সুবিধাবাদী পন্থা গ্রহণ করছে ‘রাজ্যের স্বার্থ’ রক্ষার নানা অজুহাতে। ধান্ধার ধনতন্ত্রের পর্বে এই প্রবণতা এক ধরনের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য।

ফলে প্রাক-নয়া উদারবাদ পর্বের চেনা পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে। পরিস্থিতি নতুনভাবে প্রতিকূল, অতীতের চেয়ে বেশি প্রতিকূল। আজকের সময়ে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী লড়াই স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রাম, সামাজিক বৈষম্যবিরোধী সংগ্রাম এবং নয়া উদারবাদ নির্দেশিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন-বিরোধী সংগ্রামকে আদতে আলাদা করা যাবে না।

●

ধান্ধার ধনতন্ত্রের সব ক’টি কুলক্ষণযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস দলটি জন্মকাল থেকেই সাম্প্রদায়িক শক্তির শরিক। মৌলিক কারণেই সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামের তারা শরিক নয়।

(১) প্রায় একদশক তৃণমূল সরাসরি বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটে থেকে নানা স্তরে সরকারী ক্ষমতা ভোগ করেছে। আরএসএস-বিজেপি-র যাবতীয় অপকর্মেরও সে ছিল সোৎসাহী অনুগামী, শরিক। বিজেপি তার স্বাভাবিক মিত্র। কখনও কখনও বিজেপি-তে কোনো নেতার বদলে, অন্য কোন নেতার প্রতি বাড়তি অনুরাগ তারা প্রকাশ করে থাকে। গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের ন্যূনতম ভূমিকাও নেই। বিশ্বাসযোগ্যতাও নেই।

(২) অতীতে বিজেপি জোটের একাধিক শরিকের সঙ্গে বিজেপি-র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রশ্নে অথবা রাজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত প্রশ্নে মতপার্থক্য হয়েছে। জোটে সরাসরি থাকার সময়ও জনস্বার্থ সংক্রান্ত প্রশ্নে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি-র কখনও মতবিরোধ হয়নি। মতপার্থক্য হয়েছে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে।

(৩) তৃণমূল দলটির কোন স্পষ্ট নীতির বালাই নেই। নেত্রীর উচ্চাকাঙ্খা পূরণে হেন অকাজ-কুকাজ নেই যা তৃণমূল করতে পারে না। যে-কোনো ছুতোয় যে-কোনো দিন বিজেপি-র হাত সরাসরি ধরতে তৃণমূলের বিন্দুমাত্র সংকোচ হবে না।

(৪) বিজেপি-জোটে সরাসরি থাকুক বা না-থাকুক, তৃণমূল মূলগতভাবে বিজেপি-র রাজনীতিরই পরিপূরক শক্তি। মোদী সরকারে তৃণমূল শরিক নয়, কিন্তু লিবারাইলেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশনের নীতি রাজ্যে সরকার পরিচালনার সময় নানা ভাবে রূপায়িত করছে তৃণমুল।

(৫) সাম্প্রদায়িকতা এবং বিভেদকামী রাজনীতি বিজেপি-র একচেটিয়া নয়। বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতি তৃণমূলেরও সম্বল। কখনও সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা, কখনও সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাকে, ক্ষমতার জন্য যাকে যেমন লাগে— তৃণমূল উস্কানি দিচ্ছে সুপরিকল্পিত ছকে। ধর্মীয় পরিচয়, ভাষা, উপভাষা, জাত-পাত-বর্ণ–সংকীর্ণ পরিচিতি সত্তা— যে-কোনো ছুতোয় ভেদবুদ্ধিতে উস্কানি দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভাগ করা ও পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত করা তৃণমূলের রাজনীতির ভিত্তি। উভয়েই গড়ে তুলেছে নিজ নিজ বিশেষ ছক ও স্বার্থ উদ্ধারে বেসরকারী বাহিনী ।

যেমন, স্বতপ্রণোদিতভাবে ‘ইমাম-ভাতা’ দিয়ে এরা ‘পুরোহিত-ভাতা’র প্ররোচনা দেয়। পাহাড় ও অন্যত্র ‘উন্নয়ন পর্ষদ’-র নামে এরা বিভেদের নতুন নতুন উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাজবংশী ও কামতাপুরী, মতুয়া এবং নমঃশূদ্রর মধ্যে পৃথকীকরণ এদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের উন্নয়নে জোর দেবার বদলে তৃণমূল ‘পরিচিতি সত্তা’–নির্ভর বিভেদকামী প্রবণতাগুলি জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। যেমন, শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য ‘উন্নত’ ও ‘বিশেষ’ বেতন কাঠামো করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি।

সংঘ পরিবারের ‘রামনবমী’ উদযাপনের জবাবে তৃণমূল ‘রামনবমী’ বা ‘হনুমানজয়ন্তী’ পালন করে দলীয় কর্মসূচি হিসেবে। এই প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতায় ধর্মীয় মেরুকরণের প্রবণতা সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য গাদা গাদা কাগুজে বা নামমাত্র ভূমিকার কর্পোরেশন, কমিটি গঠন শাসকদলের বেপরোয়াপনার নজির। ঐক্য নয় বিভেদ থেকে ফয়দা তোলাই লক্ষ্য।

(৬) গত সাড়ে সাত বছরে তৃণমূলী রাজত্বে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্যবস্তু

কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা— যারা কিনা ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াইয়ে সবচেয়ে নীতিনিষ্ঠ, সবচেয়ে আগুয়ান, সবচেয়ে অবিচল। তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে মোদী সরকারের বিরোধিতা করে বন্ধ পালন করলে শ্রমিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে রাজ্য সরকার।

(৭) রাজ্যে গণতন্ত্রের উপর নজিরবিহীন ফ্যাসিস্টসুলভ হামলা চালিয়ে তৃণমূল কোনঠাসা করতে চাইছে সিপিআই(এম), বামপন্থী এবং অন্যান্য আরএসএস-বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে। দেশে বিজেপি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সঙ্ঘ পরিবারের স্বার্থে লাগামছাড়া আক্রমণ করছে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেও গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ও বিপন্ন।

মোদী সরকার সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করছে। তৃণমূল সরকারও রাজ্যে তাই করছে। মোদী সরকার নাগরিক অধিকার ও মিডিয়ার স্বাধীনতার ওপর চড়াও হচ্ছে। রাজ্যে তৃণমূল সরকারও তাই। তৃণমূল চরম স্বৈরাচারী। রাজ্যে একটি পঞ্চায়েত বা পুরসভাও নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে না। স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচন লুট হয়েছিল শুধু বুথে ভোটগ্রহণের দিন নয়, মনোনয়নপত্র তোলার সময় থেকে গণনা কেন্দ্রে পর্যন্ত। পুলিশকে শাসক দলের অনুগত বাহিনীকে পরিণত করা হয় নজিরবিহীন হিংস্রতায়।

স্বৈরাচারী, কট্টর বামবিরোধী, দক্ষিণপন্থী শক্তি ইতিহাসে কখনও কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ও সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে থাকেনি, থাকে না।

(৮) পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সামাজিক পরিসরে আরএসএস-বিজেপি'র পরিসর বাড়াতে দু'দশক আগে তৃণমূল জন্মমাত্র ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তখন তৃণমূল এরাজ্যে ছিল বিরোধীপক্ষ। আজ রাজ্যে শাসক তৃণমূল ভোটের অঙ্ক কষেই আরএসএস-বিজেপি, ভিএইচপি, বা 'হিন্দু সংহতি সমিতি'-র প্রতি সহনশীল।

(৯) আর্থিক দিক দিয়ে রাজ্যকে করে তোলা হয়েছে দেউলিয়া। স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের ঋণ ছিল ১.৯২ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১১ সাল থেকে ৭ বছরেই তা বেড়ে দ্বিগুন হয়েছে – ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে ৩.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৯-২০২০ সালে (প্রস্তাবিত) ঋণ দাঁড়াবে ৪.৩২ লক্ষ কোটি টাকা ।

(১০) উভয়েই মার্কিন আশীর্বাদপুষ্ট ।

•

বিজেপি'র তথাকথিত তৃণমূল-বিরোধী বাগাড়ম্বরও আসলে বৃহৎ মিডিয়ার সৌজন্যে বানানো বৈরিতা। সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে জঘন্য 'রাজনৈতিক সেটিং'।

(১) বিজেপি দলই ১৯৯৮ সালে জোট করে সদ্যগঠিত তৃণমূল-কে সংগঠন বিস্তারে সাহায্য করেছে। তৃণমূল যেমন পশ্চিমবঙ্গে খাল কেটে সাম্প্রদায়িকতার কুমীর আনার দায় অস্বীকার করতে পারে না। তেমনই বিজেপি'ও তৃণমূলের মতো ভয়ঙ্কর দলকে পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব বাড়াতে প্রশাসনিক এবং দলীয় সাংগঠনিকস্তরে সব ধরনের সাহায্য ও মদত দিয়েছে।

(২) কেন্দ্রে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে তৃণমূলকে বিপুল রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতার পূর্ণ অপব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিল বিজেপি-ই।

(৩) বামপন্থীদের বিরোধিতায় ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে তৃণমূলের যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী ও অপরাধমূলক কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শক্তি যুগিয়েছে তৃণমূল দলও। কেশপুর, পাঁশকুড়া পর্ব থেকে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম জঙ্গলমহল— প্রতিটি ক্ষেত্রে তৃণমূলের অপকর্মের সঙ্গী বিজেপি।

(৪) ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের ক্ষমতাদখলে আরএসএস-বিজেপি-র উচ্ছ্বাস একেবারে আগলহীন। এখন তারা তৃণমূলের লোকদেখানো সমালোচনা করছে।

(৫) ২০১৪ সালে মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারকে সব ধরনের সাহায্যে অকুণ্ঠ। রাজ্যে দুর্নীতির বন্যা বইলেও বিভিন্ন খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়মিত সরবরাহ করছে মোদী সরকার। রাজ্য প্রশাসনে দুর্নীতির কোনো অভিযোগের তদন্ত তো দূরের কথা, কানে পর্যন্ত তুলছে না কেন্দ্র। রাজ্য এমনকি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পাল্টে দিলেও দ্বিধাহীনভাবে সহনশীল কেন্দ্রীয় সরকার।

(৬) সারদা-নারদা-খাগড়াগড় তদন্তের বেহাল অবস্থার সুবিধাভোগী কে? তৃণমূল দল এবং তৃণমূল সরকার। ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি ছিল, সারদা কেলেঙ্কারীর বিচার হবে। কী হলো সেই প্রতিশ্রুতির? তৃণমূল সরকার চরম স্বৈরাচারী এবং চরম দুর্নীতিপরায়ণ হলেও সেই সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি সুবিধাজনক রাখাই বিজেপি নেতৃত্বের রাজনৈতিক অবস্থান।

(৭) রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতাধর থাকার কারণে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হলে ঘোলা জলে মাছ ধরতে বিজেপি-র সুবিধা। তৃণমূল শাসিত রাজ্যে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে চরম সন্ত্রাসে কোনঠাসা করে রাখতে পারলে বিজেপি-র অতীব সুবিধা। রাজ্য রাজনীতি তৃণমূল এবং বিজেপি-র মধ্যে দুই মেরুতে বিভক্ত থাকলে সুবিধা বিজেপি-রই।

(৮) বিজেপিও রাজ্যে ক্ষমতা বাড়াতে চায়। কিন্তু বিজেপি-র মাতব্বররা এমন কিছুই করতে নারাজ যা তৃণমূলকে দুর্বল করবে। কারণ বিজেপি জানে, বিজেপি-র সব চেয়ে আপোসহীন রাজনৈতিক বাধা বামপন্থীরা।

●

কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনার পর তাকে ভোটের স্বার্থে লাগানোর ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গেও উত্তেজনা সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেছে সঙ্ঘ পরিবার। তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে তাকে উস্কে দেবার ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে। মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'ভবিষ্যতের ভূত' প্রদর্শনে জারি করেছে পুলিশি নিষেধাজ্ঞা। এরকম গণতন্ত্র-বিরোধী অভিযানের বিরাম নেই।

বিজেপি এবং তৃণমূলের অতীত থেকে বর্তমান কার্যকলাপই প্রমাণ, বাড়তি ফয়দার সুযোগ থাকলে তৃণমূল ফের আরএসএস-বিজেপি নেতৃত্বাধীন শিবিরের সরাসরি শরিক হয়ে যাবে। কোনো অজুহাতের তোয়াক্কা না করেই।

পশ্চিমবঙ্গে আরএসএস–বিজেপি-র বাড়বাড়ন্ত কখনই ঠেকানো যাবে না, যতক্ষণ তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকবে। তৃণমূলকে পরাস্ত করলে লাভবান হবে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সাফল্য দুর্বল করবে তৃণমূল জমানাকেও। তাই পরাস্ত করতে হবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় শক্তিকেই।

বিজেপি হটাতে হবে দেশ বাঁচাতে।
তৃণমূল হটাতে হবে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাতে।